

—এক টাকা সংস্করণ—

স্বামীর ঘর



শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—শ্রীমম্বোধচন্দ্র মজুমদার

“দেব-সাহিত্য-কুটীর”

২১১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দ্বাদশ সংস্করণ

১৩৪২

এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ

“নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্”

৬, চান্দাবাগান লেন, কলিকাতা

স্বামীর ঘর

প্রথম পরিচ্ছেদ

“বাঁশী, ও বাঁশী, ওবে হতভাগা।”

“বাঁশী ওবফে বাঁশীবদন তখন গোটা বাঁশেব সাড়েতিন হাত লাঠিটা খাডেব আগুনে সেকি। সোজা কবিতেছিল এবং লাঠিটা তেলে জলে স্তপক হইলে বদন সর্দাবেব লাঠি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে কি না, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় নিদি পার্শ্বতীব সঙ্গোধ আহ্বানে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, “ফেন, কি হয়েছে?”

ক্রুদ্ধস্বরে পার্শ্বতী বলিল, “হয়েছে আমার ছাদ! এখন ও-কি হচে?”

একটা চোখ বুজিয়া অপব চন্দ্রদ্বারা লাঠিখানাব কোথাও বাঁক আছে কি না তাহা নিরীক্ষণ করিতে কবিতে বাঁশী উত্তর করিল, “লাঠিগাছট, সেকে নিছি।”

তাহার দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, তিরস্কার করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “লাঠি নিয়ে তোর কি হবে বল তো? তুই কি ছোটলোকের ছেলে যে লাঠি খেলে দিন কাটাবি?”

আমীর ঘর

বাঁশী, দিদির দিকে মুখ ফিরাইয়া বিবস্ত্রিত সহিত বলিল, “ছোট-লোকের ছেলেদেরি বুঝি লাঠিখেলা শিখতে হয় ? ভদ্রলোককে শিখতে নাই ?”

পার্কীতী বলিল, “ভদ্রলোক লাঠিখেলা শিখে কি করবে ? লাঠিবাজী ক’বে দিন চালাবে ?”

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, “এই তবেই তো বলি দিদি, ‘তুমি দিদি হ’লেও নেহাৎ মেয়েমানুষ। আজকাল যে বকম দিনকাল পড়েছে, যে বকম চুবি-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হয়েছে—বেণী মাষ্টার বলে, তাতে প্রত্যেক ভদ্রলোকের ভাল বকম লাঠিখেলা শেখা দরকার।”

পার্কীতী বলিল, “হাঁ, বেণী মাষ্টারের বাপেব অনেক পয়সা আছে, আর তোর বাপও অনেক পয়সা বেগে গিয়েছে, ডাকাত এসে তোদের ঘরে ডাকাতি কববে, আর তোরা লাঠি দিয়ে ডাকাত তাড়াবি।”

বাঁশী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, “এই দেখ দিদি, তুমি ঠিক মেয়েমানুষের মতই কথাটা ব’লে ফেল্লে। আবে, আমাদের ঘরে ডাকাত নাই পড়লো, গাঁয়ে আর কাবও বাড়ীতে কি ডাকাত পড়তে নাই ? ধর, যদি হাক সমাদারের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে,—আমরা দশজন গিয়ে তো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি।”

পার্কীতী বলিল, “ও, হাক সমাদারের বাড়ী ডাকাত তাড়াবাব তরেই বুঝি তুই কাজকর্ম সব ছেড়ে বদনা সর্দারের বাড়ীতে আড্ডা জমিয়েছিলি ?”

গম্ভীরভাবে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, আড্ডা জমিয়েছি-ই তো ! এর মধ্যে লাঠিতেও হাত অনেকটা দোরস্ত ক’রে এনেছি। সর্দার বলে,

আমীর ঘর

হাঁ, লাঠিতে আমার হাত আছে বটে। তুমি দেখ না দিদি, বছরখানেক যদি শিখতে পারি, তবে দেশে এমন লেঠেল নাই যে, আমার সামনে লাঠি ধ'রে দাঁড়ায়।”

বাঁশীর কথায় পার্শ্বতীর হাসি আসিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া তিব্বতবাব-স্বরে বলিল, “তবে আর কি। কম বাহাদুরী তাতে? লোকে বলবে, অশ্বিকে হাজবার ছেলে মস্ত লেঠেল হয়েছে। কম প্রশংসাব কথা।”

দিদিব সহিত কথোপকথনে আগুনটা নিবিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে কতকগুলি শুকনা পাতা দিয়া ফুংকার দিতে দিতে বাঁশী বলিল, “নিন্দার কথাটাই বা এমনকি?”

পার্শ্বতী বলিল, “তা নিন্দাই হোক, প্রশংসাই হোক, বছর-খানেকের তো এখনো ঢের দেবি আছে। এখন ওসব ফেলে একবার বাজারে যা দেখি।”

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “বাজাবে আবার কেন? কাল’ তো দুদিনের বাজাব এনে দিয়েছি।”

বাগে জ্রভঙ্গী করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “দুদিনের নয়, দশদিনের বাজাব এনেছি। এখন উঠ'বি কি না তাই বল।”

জলন্ত আগুনে লাঠিখানাকে ঘুবাইয়া ফিরাইয়া দিতে দিতে বাঁশী বলিল, “যদি বলি উঠবো না?”

চড়া গলায় পার্শ্বতী বলিল, “তাহ'লে তোরা লাঠিকে যদি উনান-সই না কবি তবে আমি ছিদাম হাজবার মেয়ে নই।”

ঈশ্বর হাসিয়া বাঁশী বলিল, “দোহাই দিদি, এমন কাজটি ক'রো না। অনেক কষ্টে বিশেষ মাইতিব অনেক খোসামুদি ক'রে এমন

আমীর ঘর

চমৎ তার লাঠিখানা সংগ্রহ করেচি। আস্তে-রথের সময় বিশেষ ছোঁড়াকে পেট ভবে বেগুনি ফুলুরি খাওয়াতে হবে—এত কষ্টেব লাঠি আমার।”

সহাস্ত্রমুখে পার্কীতী বলিল, “তবে উঠে বাজারে যা।”

বাঁশী। তা যাচ্ছি। বাজারে আনতে হবে কি?

পার্কী। বেশী ~~কিছু~~ কিছু আনতে হবে না, আলু, পটল আর সেবগানেক মাছ।

বাঁশী। সেবগানেক মাছ। আমাদের তো একপোয়া মাছ আনলেই দখেই হয়।

পার্কী। আমাদের হয় ব'লে দুজন ভদ্রলোক আসবে, তাদেরও হবে কি?

বিশ্বয়ের সহিত বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কে? কেন আসবে শুনি?”

ধমকু দিয়া পার্কীতী বলিল, “কেন আসবে, কি বৃত্তান্ত, এত কথা শুনে তোর কি হবে? তাদের দবকার আছে তাই আসবে।”

একটু ভাবিয়া বাঁশী বলিল, “তা খাদ্যক তাদের দরকার। আমার কিছু আজ সকাল সকাল ভাত চাই।”

পার্কী। কেন, সকাল সকাল ভাত খেয়ে কোথায় যাবি?

বাঁশী। বেগী মাষ্টারের সঙ্গে চান্দাপুরে মাছ ধন্তে যাব।

পার্কী। আজ তোর যাওয়া হবে না।

বাঁশী। কেন হবে না?

পার্কী। কাজ আছে।

আমীর খয়র

বাঁশী । থাক্ কাজ, যেতেই হবে আমাকে । কথাবার্তা সব ঠিক, এতক্ষণ পুকুরে চার দেওয়া হয়ে গিয়েছে ।

বোধ-কঠিন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পার্শ্বতী ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “আচ্ছা, যা তুই । কিন্তু আমিও যদি আজ দবজায় চাবি দিয়ে যে দিকে হুঁচকু যায় চলে না যাই, তবে আমাব নাম পার্শ্বতীই নয় ।”

দিদিব রাগ দেখিয়া বাঁশী ঘেন একটু দমিয়া গেল, অপেক্ষাকৃত শান্ত বিনয়স্বরে বলিল, “তুমি চলে যাবে কেন ?”

অভিমানমূলক-কণ্ঠে পার্শ্বতী উত্তর কবিল, “যাব না তো কি করবো ? কেন, কি স্থখে এখানে থাকবো ? শুধু তোমার জন্তে—তোমার মুখ চেয়ে সব ছেড়ে এখানে আমি অনাথার মত প’ড়ে রয়েছি, কিন্তু তুই যদি আমার মুখের দিকে না চাইবি, আমার কথা না শুনিবি, তাহ’লে আর আমাব কি স্থখে এখানে থাকা ? এর চেয়ে আমাব মরণই যে ভাল, বাঁশী ।”

হুঃখে অভিমানে পার্শ্বতীর চোখ দুইটা ছলছল করিতে লাগিল । দিদিব চোখে জল দেখিয়া বাঁশী আর স্থির থাকিতে পাবিল না, ব্যগ্র-স্বরে বলিল, “তুমি রাগ কচ্চো কেন দিদি, আমি তোমার কোন্ কথাটা না শুনি ?”

অশ্রুদগদকণ্ঠে পার্শ্বতী বলিল, কোন্ কথাই বা শুনিচ্ছ ? সতেরো আঠারো বছরের ছেলে হ’লি, আমার সাধ, বিষে-খা ক’রে তুই সংসারী হবি, তোমার বৌকে নিয়ে, তোমার দু’টো কাক্সা-বাক্সা নিয়ে হুঃখের জীবনে আমি স্থখের সংসার পেতে বসবো । কিন্তু তোমার সেই ধনুকভাঙ্গা পণ—বিয়ে করবি না ।”

আমীর খয়র

পার্করতী আচলের খুঁটে চোখ দুইটা মুছিল। বাঁশী নতমুখে লাঠিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল “আচ্ছা দিদি !”

“কেন ?”

“বিয়ে ক’রে কি হবে ?”

“হবে আবার কি ? বিয়ে করলে সংসারী হবি।”

গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, “এখন বিয়ে না ক’রে সন্ন্যাসী হ’য়ে আছি না কি, দিদি ?”

ঈশৎ হাসিয়া পার্করতী বলিল, “সন্ন্যাসী হ’তে যাবি কেন ? তবে সংসারে থাকতে হ’লে বিয়ে না করলে কি চলে ?”

মাথা দোলাইয়া বাঁশী বলিল, “অচলটাই কি হ’য়ে আছে শুনি। দিবি তুমি রেঁধে-বেড়ে দিচ্ছো, আমি খেয়ে-দেয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছি।”

পার্করতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, “না, তুই একেবারে পাগল। আমি কি চিবকাল তোকে রেঁধে-বেড়ে দেব, আব তুই খেয়ে-দেয়ে ঘুরে বেড়াবি ?”

বিশ্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি রেঁধে দেবে না ত’ কে আবার রেঁধে দেবে ? বেন্দার মা না কি ?”

পার্করতী হাসিয়া বলিল, “বেন্দাব মা কেন রে, বৌ এসে রেঁধে দেবে।”

জোরে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী আশ্বারের স্বরে বলিল, “উহু, ও সব বউ-টৌউ রেখে দাও। তুমি ছাড়া কারুর হাতের রান্না আমার পছন্দ হয় না, খেলে পেটও ভরে না।”

স্নেহসঙ্গলদৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া পার্করতী বলিল, “আচ্ছা

আমীর ঘর

আচ্ছা, পেট ভরে কি না দেখবো। বৌ ত' নিয়ে আসি আগে, তখন আবার আমার রান্না তেঁতো লাগবে।”

বিশ্বয়েব সহিত বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যি?”

পার্কতী বলিল, “সত্যি নয় তো কি মিছে? এ বেন্ধার ছিটি থেকে হয়ে আসছে। তখন আবার দিদি হয়ে যাবে পর, বৌ হবে আপন।”

পার্কতী একটু হাসিল। চিন্তা-গস্তীরমুখে বাঁশী বলিল, “তবেই তো দিদি—তোমার হাতের রান্না তেঁতো লাগবে, তুমি পর হয়ে যাবে! না দিদি, ভাই-বোনে দিব্যি মিলেমিশে আছি, কেন মিছে একটা পরের মেয়েকে এর মাঝে এনে গোলমাল বাধিয়ে দেবে? গেবে তুমি শুধু পর হয়ে দাঁড়াবে।”

খুব কাছে সবিসা গিয়া ভ্রাতার মাথায় হাতখানি রাখিয়া স্নেহার্জকণ্ঠে পার্কতী বলিল, “তা আমি পর হই হ'ব, কিন্তু তুই আর অমত করিস না বাঁশী। লক্ষ্মী ভাই আমার, সোণা আমার, দিদিব কথাটি রাখ্।”

গস্তীরমুখে বাঁশী বলিল, “তা বেন রাখ্ছি দিদি, কিন্তু তুমি পর হয়ে যাবে—”

হাস্ততরলকণ্ঠে পার্কতী বলিল, “তুই যেমন পাগল! ই রে বাঁশী, সত্যি সত্যিই আমি পর হয়ে যাব, না তুই আমাকে পর ক'রে দিতে পারবি? ও একটা কথার কথা।”

বাঁশী নীরবে চিন্তিতভাবে, লাঠিব আগাটা মাটিতে ঠুকিতে লাগিল। পার্কতী বলিল, “কি বল, আমার কথা রাখ্বি তো?”

মুখ না তুলিয়াই বাঁশী উত্তর করিল, “রাখ্বো।”

পার্কতীর মুখখানা আশার আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, “আজ আর তাহ'লে ছুটামি ক'রে পালাবি না?”

স্বামীর স্বপ্ন

বাণী গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল, “না। কিন্তু দেখো দিদি, এর পর যদি আমাকে পর ক’বে দাও, তখন—চেন তো তুমি বাণীকে, এই লাঠি তোলা বইল, তখন তোমার একদিন কি আমার একদিন।”

সবেগে মাথাটা দোলাইয়া বাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্কতী হাসিতে হাসিতে হাত ধবিয়া তাহাকে বাডীৰ ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই অশান্ত প্রকৃতি ভাইটিকে লইয়া পার্কতীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সহোদব ভাই নয়, খুঁড়াব ছেলে। মা বাপ মারা গেলে পার্কতীও এই খুঁড়া-খুঁড়ীর কাছে মাতৃব হইয়াছিল এবং বাণী ভূগিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল। বিবাহের পর যে কয়দিন স্বস্ত্রবাডীতে ছিল, সে কয়দিন ছাড়া তাহাকে কোলে হইতে নামাইতে পারে নাই। স্বস্ত্রবাডীতেও যে কয়দিন থাকিতে হইয়াছিল, সেই কয়দিনও বাণীব ভাবনা ভাবিয়া, বাণীব জন্ত কাঁদিয়া কাটিয়া আহাৰ-নিদ্রা ভাগ করিয়াছিল। সেখান হইতে ফিবিয়া আসিলে বাণী যখন তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, স্বকোমল হাত দু’খানিতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অক্ষুট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দিদি তাহাকে ফেলিয়া এই কয়দিন কোথায় গিয়াছিল, তখন পার্কতীব মনে হইয়াছিল যেন কোন্ সুদূর দীপান্তর হইতে সে কতকালের পর স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

স্বামীর ঘর

বাঁশীব বয়স যখন ছয় কি সাত বৎসর, তখন খুড়া পরলোকগমন করিলেন, এবং তাহার অল্পকাল পরেই খুড়ী মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া পার্শ্বতীর হাতে বাঁশীকে সঁপিয়া দিয়া স্বামীব অঙ্গগমন করিলেন।

খুড়া-খুড়ীর মৃত্যুর পর পার্শ্বতীকে যখন স্বামীগৃহে যাইতে হইল তখন সে—স্বামী কানাচাদের অহুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বাঁশীকে সঙ্গে লইয়া গেল। কিন্তু সেখানে লইয়া গিয়া পার্শ্বতী যেন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। কানাচাদের গৃহে তাহার শুচিবায়ুগ্রস্তা এক বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। তিনি যে কেবল শুচিবায়ুগ্রস্তা ছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতৃপুত্রের আন-ব্যাঘের দিকে তাঁহার বীতিমত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এক্ষণে কানাচাদের ছোট ভাই গোবাচাঁদ কৃপণ বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচার করিলেও পিসী কিন্তু ডাক্‌বা-গোবার সে নিন্দার কর্ণপাত করিতেন না, এবং এই নিন্দার আশঙ্কায় সংসারের ব্যয়ের দিক্ হইতে দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া লইতে পাবেন নাই।

এই কৃপণ-প্রকৃতি পিসী যখন দেখিলেন, বড় বৌয়েব সঙ্গে একটি কপোব্য আগিয়া সংসারের ব্যয়ের মাত্রাটা অকাবণ অনেকটা বাড়াইয়া গিল, তখন তিনি বাঁশীকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। ইহার উপর কানাচাঁদ যখন দ্রাবি খাতিরে বাঁশীর জন্ত একপোয়া ছব, এবং সকালে বিকালে মূড়ীর সঙ্গে একটু গুড় বা বাতাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, তখন এই বন্দোবস্ত পিসীর নিকট নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। সে অসহিষ্ণুতা তিনি মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে গুনুবাইতে লাগিলেন।

তা মুখে তিনি প্রকাশ না করিলেও পার্শ্বতী কিন্তু পদে পদে তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা বা অসন্তোষটুকু লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাঁশীজন্ত

আমীর ঘর

অনীত দুধটুকু প্রায় বিড়ালে খাইয়া যায়, গুড়ের সঙ্গে গুড় অপেক্ষা পিপীলিকার ভাগটা অতিবিক্ত হইয়া থাকে, বাঁশী খাইতে বসিলে যত মাছের কাঁটা আসিয়া তাহার পাতে পড়ে, ইত্যাদি। এ সকল দেগিয়াও পার্শ্বতীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। উপায় কি? পিসীমাই যে সংসারের কত্রী, তাহার উপরে কথা কহিবার শক্তি তো পার্শ্বতীর নাই, বাঁশীর যেমন রূপাল।

তা শুধু এইখানেই যদি পিসীমার অসন্তোষ-বহিঃ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু এই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বাহিরে এক একটা ক্ষুণ্ণ মধ্য মধ্য পার্শ্বতীর উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই বাঁশী এঁটো-হাতে কাচা কাপড়গানা ছুঁইয়া ফেলিল। ঐ মাঃ, কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া জলের কলসীতে হাত দিল, আবার সাত-পঁঠা ভাঙ্গিয়া জল তুলিয়া আনিতে হইবে। এই বে, ছোঁড়া মাথা খাইল, ছুটিয়া যাইতে যাইতে পিসীমার কাপড়ে তাহার অঙ্গস্পর্শ হইয়া গেল! এই দারুণ শীতে সন্ধ্যার সময় বুড়ীকে আবার কাপড় কাচিয়া মবিতে হইবে। নাঃ, কোথাকার এক মা-বাপ গেকো ছেলে আসিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিল রে। না বাপু, এমন জ্বালাতন সহিয়া পিসীমা টিকিতে পারিবে না, তাহাতে যে যাহাই মনে করুক, তাঁহাকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক। আগ্নিক আজ কাল, পিসীমার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া সে আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া স্নেহে থাকুক, পিসীমা কিন্তু রোগ-শোক-জর্জরিত দেহে এত জ্বালাতন সহিতে পারিবে না।

এইরূপ অভিযোগ দিনে দশবার পার্শ্বতীর কাণে আসিত, শুনিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত,

আমীর ঘর

তখন কাহারও কিছু করিতে না। পাবিয়া বাঁশীর পিঠেই চড়-চাপড় বসাইয়া দিত। তারপর রোক্তমান বালককে বুকে চাপিয়া নিজের অশ্রুধারায় তাহার প্রহার-বেদনা দূর করিয়া দিতে থাকিত।

দেখিয়া গুনিয়া পার্শ্বতী একদিন আমীকে ধবিল, বাঁশীব এখন কি কবা যায়? কালাচাঁদ লোকটি সাদা-সিদা ধবণের, স্তত্রাং সে নিশ্চিন্তভাবেই উত্তর করিল, “কি আর করা যায়? যেমন আছে তেমনি থাক।”

পার্শ্বতী বলিল, “কিন্তু পিসীমাকে বড় আলাতন হ’তে হয়।”

নিতান্ত উপেক্ষাব সহিত কালাচাঁদ বলিল, “তী হয় তো কি কববো?”

আমীর উত্তর গুনিয়া পার্শ্বতী বুঝিতে পাবিল, তাহার নিকট প্রতীবারেব কোন আশা নাই। বাঁশীকে এই নির্ধ্যাতন সহিয়াই এখানে থাকিতে হইবে, এবং ইহা দেখিয়াও তাহাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইবে।

পার্শ্বতী কিন্তু বেশী দিন চুপ কবিয়া থাকিতে পারিল না। বাঁশীর আলাতনে অস্থির হইয়া পিসীমা যখন বাঁশীকে ছাড়িয়া পার্শ্বতীর ও পার্শ্বতীর মৃত পিতা-মাতার উপর পড়িলেন, তখন পার্শ্বতী তাহার রুদ্ধ উক্তির দুই একটা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। ইহাতে ফল কিছুই হইত না, লাভের মধ্যে পিসীমার ক্রোধ-বহি শতগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত, এবং সে আগুনে তিনি যেন সমগ্র সংসারটাকেই দগ্ধ করিতে উত্তত হইতেন। এক একদিন তিনি এতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন যে, কালাচাঁদের গৃহত্যাগ করিয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে চলিয়া যাইবার জ্ঞাত দ্বিতীয় পরিধেয়ানা বগলে লইয়া বাড়ীর

আমীর ঘর

বাহির হইয়া পড়িতেন। গোরাচাঁদ অনেক কানুতি-মিনতি করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইত।

ক্রমে এমন হইল যে, দিনরাত ঝগড়া যেন লাগিয়াই বহিল, পিসীমার তর্জন-গর্জনে, দুঃখে আক্ষেপে বাড়ীতে কাণ পাতা যেন দায় হইয়া উঠিল।

গোরাচাঁদ ইহাতে বিরক্ত হইয়া একদিন জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “বাড়ীতে আর টেকা যায় না, দাদা। হয় তোমার সম্বন্ধটিকে তাড়াও, নয় পিসীমাকে তাড়াও।”

কালচাঁদ হাসিয়া বলিল, “পিসীমাকে কোথায় তাড়াব বে, বোকা?”

গোরা। .তা’হলে ঝগড়াকে তাড়াতে হয়।

কাল। ওই বা যায় কোথায়? ওর আশ্রয় থাকিলে কি এখানে আসে?

গোরা। তা হ’লে বল, আমিই বাড়ী ছেড়ে চ’লে যাই। দিনরাত কলহ-কিচ্-কিচি—বাড়াব লক্ষ্মা বে ছেড়ে যাবে।

কাল। যার, উপায় তাব কি আছে?

গোরাচাঁদ একটু ভাবিয়া বলিল, “বডবৌ যদি একটু চুপ ক’রে থাকে তাহ’লে এতটা হয় না। তাঁকে একটু সঙ্গে থাকতে বলে দাও।”

কালচাঁদ বলিল, “আচ্ছা, তাই বলবো।”

পার্বতী কিন্তু নীরবে এমন অগ্নার নিষ্যাতন সহিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না, বলিল, “তার চাইতে আমি এবাড়ী ছেড়ে যামি। বাপের ঘর-ভিটে আছে, বাঁশীকে নিয়ে আমি সেইখানে থাকবো।”

কালচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, “থাকতে পারবে?”

জোর গলায় পার্বতী বলিল, “খুব পাববো।”

পার্বতী বলিল, “তফাৎ হয়, আমি কি কববো? আমি যদি মরে যাই।”

একটুও না ভাবিয়া কালচাঁদ বলিল, “তা হ’লে আমাকে আবার বিয়ে কত্তে হবে।”

বাগে মুখখানা লাল করিয়া পার্বতী বলিল, “তবে তাই কর গে। মনে করবে আমি ম’রে গিয়েছি।”

খানিক ভাবিয়া কালচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, “তাহ’লে তুমি যাবে না?”

দৃঢ়স্বরে পার্বতী উত্তর করিল, “না।”

অগত্যা কালচাঁদ হতাশভাবে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া পার্বতী বাঁশীর শিকার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল।

বাঁশী কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার ততটা মনোযোগ দিতে পারিল না। দুই তিন বৎসর পাঠশালায় যাতায়াত করিয়াও সে দুই তিনখানা বই শেষ করিতে পারিল না। পাঠশালায় কিছু হইবে না দেখিয়া পার্বতী তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। আব ক্রোশ দূরে স্কুল, একটা মাঠ পার। বাঁশী দিনকতক বেশ নিয়মিতভাবে স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনপরেই তাহার স্কুলের উপর শ্রদ্ধাটা কমিয়া আসিল। আজ বেলা হইয়া গেল, আজ পায়ে বাথা হইয়াছে, আজ বড কাদা ইত্যাদি ওজর করিয়া সে স্কুল কামাই করিতে লাগিল। পার্বতী অনেক বুঝাইয়া ধমক দিয়া তাহাকে স্কুলে পাঠাইলে সে মাঠে আসিয়া গাছের কোটরে বই-খাতা রাখিয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হইত, গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িত, পুকুরে সাঁতার কাটিয়া সম্বর-বিজ্ঞায় পারদর্শিতা-লাভের চেষ্টা করিত। তার পরে নিয়মিত সময়ে ঘরে ফিরিয়া দিদির কাছে আদর যত্ন লাভ করিত।

স্বামীয় ঘর

কানাটাদ বলিল, “তবে আপাততঃ তাই গিয়ে থাক।”

তাহাই হইল, বাঁশীকে লইয়া পার্শ্বতী নিত্ৰানয়ে চলিয়া আসিল।
বাপের ও খুড়ার যে জমি-জায়গা ছিল, তাহাতে একপ্রকার স্থগে
স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাসকয়েক পবে একদিন কানাটাদ সেখানে উপস্থিত হইল, এবং
পার্শ্বতীকে বলিল, “এবার চল, পার্শ্বতী।”

পার্শ্বতী বলিল, “আমি যাব, কিন্তু বাঁশী কোথায় থাকবে?”

আবার সেই বাঁশী। কানাটাদ চিন্তিতভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল।
পার্শ্বতী বলিল, “বাঁশীকে একা কেনে আমি যেতে পারবো না।”

কানাটাদ বলিল, “কিন্তু না গেলে সংসার যে চলে না। পিসীমা
বুড়ো-হাড়ে আর কত খাটবেন? ছোটবোঁমা তো ছেলেমানুষ।”

অভিমাণে মুখখানা ভাবি করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “যদি শুধু
সংসারে খাটবার জন্তেই আমাকে দরকার হয়, একজন চাকরানী রাখতে
পার।”

কানাটাদ কিন্তু তাহার অভিমানটুকু বুঝিতে পারিল না; বেশ
সহজভাবেই বলিল, “তোমার কাজে আর ঝি-চাকরানীর কাজে অনেক
তফাৎ।”

স্বামীর স্বপ্ন

এইরূপে সে চারি বৎসরেও যখন দুইটা শ্রেণী অতিক্রম করিতে পারিল না, এবং চোদ্দ পোনের বছরের ছোকরাকে ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাসে বসিতে দেখিয়া স্কুলের ছেলেরা টিটকারী দিতে আরম্ভ করিল, তখন বাণী রাগে স্কুল ছাড়িয়া দিল। পার্কতীও কিছু হইবে না ভাবিয়া চেষ্টা হইতে বিরত হইল। বাণী তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছিপি ফেলিয়া, তাস খেলিয়া, লাঠিখেলা শিখিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

ইহাব মধ্যে কালাচাঁদ দুই তিনবার আসিয়াছিল এবং পার্কতীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। পার্কতী কিন্তু স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিল না, বাণীকে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইল না। কালাচাঁদ বাণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিল। পার্কতী কিন্তু বাণীকে সেখানে লইয়া গিয়া তাহার অবমাননা করিতে রাজি ছিল না। কাজেই সে বরাবর কালাচাঁদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল। শেষবারে কালাচাঁদ আসিয়া বলিল, “তুমি যদি না যাও পার্কতী, তাহ’লে পাঁচজনের অনুরোধে আমাকে আবার বিয়ে কত্তে হবে।”

পার্কতী বলিল, “তুমি স্বচ্ছন্দে বিয়ে কত্তে পার।”

বিবাদগস্তীরস্বরে কালাচাঁদ বলিল, “কিন্তু সেটা কি ভাল হবে?”

পার্কতী বলিল, “ভাল হোক মন্দ হোক আমি যখন যাচ্ছি না, তখন বিয়ে না ক’রে তুমি কতদিন থাকবে?”

কালাচাঁদ বলিল, “তুমি যদি আশা দাও, তবে যতদিন বল, ততদিন থাকতে পারি।”

একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্কতী বলিল, “তেমন আশা আমি দিতে পারি না, আমার আশা ত্যাগ কর।”

স্বামী ঘর

অগত্যা কালাচাঁদ নিতান্ত দুঃখিতভাবেই কিরিয়া গেল, তাহার চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই পার্শ্বতী সংবাদ পাইল যে, কয়দিন পূর্বে কালাচাঁদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সে সংবাদ ঠিক একটা আশ্বিনের হলুকার মত আসিয়া পার্শ্বতীর বুকে একে ঘেন বালুসাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, চারিপাশে সংসারটা ঘেন দাবান্নির তেজে দাউ দাউ জলিয়া উঠিয়াছে।

সে আশ্বিনে জল ঢালিবার জন্য পার্শ্বতী বাঁশীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, “বিয়ে করবি, বাঁশী?”

বাঁশী এক কথায় ইহাতে সায় দিয়া বলিল, “হঁ, কেন বিয়ে করবো না? তবে টুকটুকে বউ চাই কিন্তু।”

পার্শ্বতী ঘটক ঠাকুরকে ডাকাইয়া টুকটুকে বোয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। সে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভাবিয়া লইল, করুন না স্বামী বিয়ে! সংসারে স্বামীর ঘর ছাড়া কি আর সুখ নাই? এই যে, যাহাদের স্বামী থাকে না, তাহারা কি একেবারেই দুঃখী। বাঁশীর বিবাহ দিব, লক্ষ্মীর মত বৌ একটি আসিবে, তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার সহিত ঘরকন্না করিয়া যে শান্তি পাইব, তাহা কি স্বামীর ঘরে পিসীমার বাধ্য-বস্ত্রণা অপেক্ষা সুখদায়ক হইবে না? তার পরে বাঁশীর দুই একটা ছেলেকে নেয়ে হইবে, তাহাদিগকে নাড়িয়া চাড়িয়া মানুষ করিব, তাহাদের আবার বিবাহ দিব। বিধাতা একটা সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন, কিন্তু এ সুখের পথ ত আমার নিজের হাতে।

পার্শ্বতী জানিত না, সুখ-দুঃখ কিছুই মানুষের হাতে নাই, তাহার জন্য মানুষকে সর্বদা বিধাতার মুখ চাহিয়াই থাকিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটকের চেষ্ঠায় স্তম্ভরী পাত্রী মিলিল। মনোমত বৌ হইবে শুনিয়া পার্শ্বতীর আহ্লাদের সীমা হ্রহিল না, আনন্দসহকারে বাঁশীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ রে বাঁশী, টুকটুকে বৌ তো ক’রে দিচ্চি, কিন্তু বৌ পেয়ে শেষে দিদিকে ভুলে যাবি, না তো?”

বাঁশী উত্তর দিল, “বৌ পেলো দিদিকে ভুলে যেতে হয় না কি!”

পার্শ্বতী বলিল, “তা কি হয়? তবে অনেকে ভুলে যায় বৈ কি। এ যে বোদে ঘোষ—পিসী কত কষ্টে তাকে মানুষ করলে, বিয়ে দিলে, কিন্তু বৌ পেয়ে সে ঐ পিসীর কি দুর্গতিটাই না করলে!”

আশ্চর্য্যাব্বিতভাবে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যি?”

পার্শ্বতী বলিল, “সত্যি নয় তো কি মিছে বে, এ যে আমার নিজের চোখে দেখা। আহা, বুড়ী কি কান্নাটাই না কাঁদতো!”

বাঁশীর মুগথানা গম্ভীর হইয়া আসিল। পার্শ্বতী স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তা বোদে ঘোষ তোর পিসীর দুর্গতি করেছে ব’লে তুই কখনো তোর দিদির ভেমন দুর্গতি কন্তে পারবি না, কি বলিস?”

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বাঁশী বলিল, “পারবো কি না সে কথা এখন কি ক’রে বলবো?”

পার্শ্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তা কন্তে পারিস্ করবি, এখন যা দুর্গার ইচ্ছায় চার হাত এক ক’বে দিতে পারলে হয়!”

স্বামীর স্বর

মা দুর্গার এ বিষয়ে ইচ্ছা কি অনিচ্ছা ছিল বলা যায় না, পার্বতী কিন্তু চার হাত এক করিয়া দিয়া বাসনা পূর্ণ করিতে পারিল না। পাত্রীর পিতা যেদিন অপরাহ্নে বাণীকে আশীর্বাদ করিতে আসিল, বাণী সেইদিন সকালে উঠিয়াই সেই যে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, সারা-দিন-রাত্রির মধ্যে সে আর বাড়ীতে ফিরিল না। পার্বতী পিতার প্রজ্ঞা বৃন্দাবন বাগ্দীকে দিয়া কত অহুসঙ্কান কবিল, বৃন্দাবন কিন্তু সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও বাণীর কোন সন্ধান পাইল না। সকালে পাত্রীর পিতা সন্নী-ভদ্রলোকদের সহিত হতাশচিত্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে বাণী ফিরিয়া আসিল। পার্বতী তাহাকে ধমক দিয়া ত্রিভাঙ্গা করিল, “কোথায় ছিলি রে বাণী?”

বাণী অসঙ্কচিতভাবেই উত্তর দিল, “সেনপুরে যাত্রা শুন্তে গিয়েছিলুম।”

পার্বতী বলিল, “সারাদিন-রাত ধ’বে যাত্রা শুন্ছিলি?”

বাণী বলিল, “সারাদিন-রাত ধ’রে কি যাত্রা হয়? দিনে যাত্রা হবার কথা ছিল, কিন্তু দল এসে পৌছেনি ব’লে দিনে হলো না, সন্ধ্যার পর যাত্রা জুড়েছিল, ভাঙতে ভোর হয়ে গেল!”

রাগে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া পার্বতী বলিল, “আমার ছাদ হ’লো। পাকা দেখতে এসে ভদ্রলোকেরা ফিরে গেল, আর তুই কি না গেলি যাত্রা শুন্তে। ধগ্গি যা হোক তোর যাত্রা শোনা!”

ঘাড় দোলাইয়া বাণী বলিল, “বাঃ রেঃ, পাকা দেখতে আসবে ব’লে যাত্রা শুন্বো না? এ কি যে সে যাত্রা! কলকাতার ভূষণ দাঁসের দল। অভিমহ্যবধ গাইলে; আঃ, কি চমৎকার গাইলে, তা তোমাকে

খামীর ঘর

কি বলবো দিদি। তুমি যদি শুন্তে, চোখে জল রাখতেই পারতে না। একটা ছেলে যা গাইলে। চমৎকার গানটি, আমি মুগ্ধ ক'রে ফেলেছি, 'দাদা অভি কেন যাবি, দাদা অভি কেন যাবি'—এই দেখ, সারা রাস্তাটা মুগ্ধ ক'রে এলুম, আর ঘরে এসে তোমার একটা ধমক খেয়েই সব ভুলে গেলুম।”

পার্বতী হাসিয়া উঠিল, বলিল, “আচ্ছা আচ্ছা, এখন নেয়ে এসে কিছু খা, দেখি। মুগ্ধ তো শুকিয়ে যেন আমসী হ'য়ে গিয়েছে। কি খেয়েছিলি?”

বাঁশী বলিল, “তা খুব খেয়েছি, তিন পয়সার মুড়ী।”

পার্বতী শুনিয়া যেন আতকাইয়া উঠিল, বলিল, “এঁা, তিন পয়সার মুড়ী খেয়ে দিন-বাত কাটিয়েছিলি? ও, তার মধ্যে যাত্রা খেয়ে যে পেট ভ'বে গিয়েছে।”

“তা গিয়েছে বটে” বলিয়া বাঁশী হাসিতে হাসিতে জ্ঞান করিতে গেল। পার্বতী তাহাব আহ্বারের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

কয়েকদিন পরে পুনরায় আবার আশীর্বাদে দিন স্থির করিয়া বাঁশী-পক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট দিনে পার্বতী সকালেই বাঁশীকে বলিয়া দিল, “আজ পাকা দেখা দেখতে আসবে বাঁশী, আজ আবার যেন যাত্রা শুন্তে যাস না।”

বাঁশী বলিল, “যাত্রা কি রোজই হচ্ছে দিদি! তারা কখন আসবে?”

“বিকালে। রাত্রে আশীর্বাদ হবে।”

“আচ্ছা!”

সেদিন বাঁশী যাত্রা শুনিতে গেল না বটে, কিন্তু ভাত খাইয়া সেই

স্বামীর ঘর

যে ছিপ লইয়া বাহির হইল, সারা রাজ্যের মধ্যে আর দেখা দিল না। পার্শ্বতীর অহরোধে বেঙ্গা গ্রামের প্রত্যেক পুত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া হযরান্ হইয়া পড়িল। পাজীপক্ষ নিতান্ত বিরক্তভাবে ঘটক ঠাকুরের সহিত পার্শ্বতীকে গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

খানিক বেলায় বাঁশী ছিপ হাতে উপস্থিত হইলে, পার্শ্বতী রাগে তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে অল্পপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বাঁশী তখন বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল, “হুঃখের কথা আর কও কেন দিদি, কাল নদীতে ছিপ ফেলতে গিয়েছিলুম। গিয়ে বসতে নু বসতেই একটা সের-হুঃয়েক কইমাছ লীকার। দেখে লোভ হ’লো, বলি বেলা তো এখনো ঢের আছে। আবার ছিপ ফেলে বসে আছি। জলের ধার, দিবা ফুরুরে হাওয়া—ঘুমে চোখ দুটো যেন জড়িয়ে এলো। বাঁধের ভাঙ্গনটার ভিতর গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, অমনি ঘুম। এক ঘুমেই রাত কাবার। জেগে উঠে দেখি, সকাল হয়ে গিয়েছে। ছিপ গাছা প’ড়ে রয়েছে, মাছটা বোধ হয়, শিয়ালের পেটে গিয়েছে।”

তবে পার্শ্বতী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, “বলিস্ কিরে বাঁশী, নদীর ধারে ঘুমিয়ে রাত কাটালি? তোর ভয় করলো না?”

বাঁশী হাসিয়া উত্তর করিল, “ঘুমুলে কি ভয় থাকে দিদি! যতক্ষণ জেগে থাকা যায়, ততক্ষণ ভয়ভর যা কিছু।”

পার্শ্বতী বলিল, “কিন্তু যদি আর কোন দিন নদীর ধারে মাছ ধরতে যাবি, তা হ’লে ভাল হবে না বলছি।”

এ সম্বন্ধে ভাবিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর পুনরায় অন্তত পাজীর অল্প-সন্ধান করিতে লাগিলেন। পাজী মিলিল, পাজীপক্ষ বরকে আশীর্বাদ

বামীর ঘর

করিতে আসিল, কিন্তু আশীর্বাদের সময় বরকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বেন্দার বাধায় বাজার চাপাইয়া দিয়া একটু পিছনে আসিতে আসিতে বামীর এমন দিশা লাগিল যে, বিকাল হইতে সমস্ত রাত্রিটা সে মাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং সকালে দিশা ছাড়িলে ঘরে ফিরিয়া দিদির কাছে দিশা লাগার বিবরণ সবিস্তারে কীৰ্ত্তন করিল।

এমন দুই এক জায়গায় নয়, পাঁচ সাত জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু আশীর্বাদের দিন একটা-না-একটা বাধায় বামী অল্পপস্থিত থাকিলে সে সকল সম্বন্ধ পণ্ড করিয়া দিল। ঘটকঠাকুর বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

প্রত্যেকবারেই এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া পার্শ্বতীর মনে সন্দেহ জন্মিল। সে বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা বামী, কথাটা কি বল্ দেখি? বিয়ে কন্তে কি তোর ইচ্ছা নাই?”

বামী বলিল, “ইচ্ছা আবার নাই? খুব ইচ্ছা আছে দিদি।”

পার্শ্বতী বলিল, “ইচ্ছা আছে তো এ রকম কচ্চিস্ কেন?”

দুঃখিতভাবে বামী বলিল, “আমি কি ইচ্ছা ক’রে এ রকম করি দিদি, হয়ে পড়ে।”

গম্ভীরভাবে পার্শ্বতী বলিল, “দেখ বামী, আমি তোর দিদি, তোর চাইতে বয়স আমার ঢের বেশী। তুই কি মনে করিস, তোর চালাকি আমি বুঝতে পারি না?”

বামী। চালাকিটা আমার কি দেখ্লে, দিদি?

পার্শ্ব। বিয়ে করিতে তোর মন নাই।

বামী। মন নাই, একথা তোমাকে কে বল্লে?

আমীর ঘর

পার্ক। আমি বলছি। কৈ, আমাকে ছুঁয়ে বস দেখি ?

বাণী চুপ করিয়া রহিল। পার্কতী বলিল, “কেমন, আমি ঠিক ধরেছি কি না ?”

ঈশ্বর হাসিয়া বাণী উত্তর করিল, “তা হবে।”

পার্কতী বলিল, “তা হবে নয়, এইটাই ঠিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিয়ে কস্তে তোর ইচ্ছা নাই কেন ?”

বাণী। এ কেনর উত্তর নাই দিদি।

পার্ক। কিন্তু এর উত্তর না শুনে আমি ছাড়বো না।

বাণী। নেহাৎ শুনবে ?

পার্ক। হাঁ, শুনবো।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বাণী দৃঢ় সতৈজকণ্ঠে বলিল, “আমি বিয়ে করলে তোমার খুব আহ্লাদ হয় তা জানি, কিন্তু বোদে ঘোষ হ’লে আমার তাতে একটুও আহ্লাদ হবে না, তা জেনো।

উত্তর দিয়াই বাণী দিদির সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল। তাহার কাছে বোদে ঘোষের গল্প করার জগু পার্কতী মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ইহার পর পার্কতী মাঝে মাঝে বাণীকে কত বুঝাইল, কত প্রলোভন দেখাইল, কত দুঃখ প্রকাশ করিল, কিন্তু বাণীর সেই এক উত্তর—না। বারবার অনুরোধে উত্যান্ত হইয়া শেষে একবার হাঁ বলিল বটে, কিন্তু সেবারে মেয়ে পাওয়া গেল না, ঘটক ঠাকুর বারবার অপমানিত হইয়া মেয়ে দেখিতে স্বীকৃত হইল না। পার্কতী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। :কি করিবে, কাহার দ্বারা পাত্রীর অনুসন্ধান করাইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

স্বামীর ঘর

এই সময়ে কালাচাঁদ একদিন কার্ঘ্যালুরোধে গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইল। পার্শ্বতী লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিয়া তাহাকে বলিল, “বাঁশীর জন্তে একটি মেয়ে দেখে দিতে পার ?”

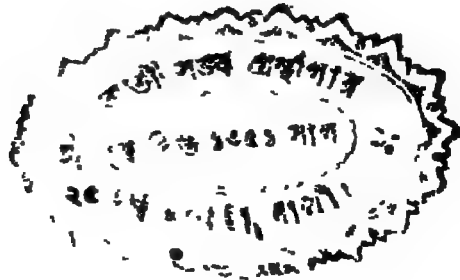
কালাচাঁদ বলিল, “তা পারবো না কেন ? মেয়ের অভাব কি ?”

পার্শ্বতী বলিল, “মেয়েই অভাব নাই বটে, কিন্তু আমার চেষ্টা করুবার লোকের অভাব।”

কালাচাঁদ বলিল, “আচ্ছা, আমি শীগগীর মেয়ে দেখে দিচ্ছি।”

দিনকয়েক পরে পার্শ্বতী একখানি পত্র পাইল। কালাচাঁদ লিখিয়াছে, বেশ সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গিয়াছে। সোমবার কল্যাণপুরে দুই একজন আত্মীয় সঙ্গে পাত্র দেখিতে যাইবে, এবং পছন্দ হইলে একেবারে আশীর্বাদী হইয়া যাইবে।”

এই সংবাদে পার্শ্বতী পুলকিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই চিন্তাটাও আসিল, এবারেও যদি বাঁশী আগেকার মত পলাইয়া যায় ? তাহা হইলে স্বামীর নিকট তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। সুতরাং ৭ দিনরাত বাঁশীকে পাখী পড়াইতে লাগিল। পরিশেষে তাহার রাগেব ভয়েই হউক বা কাতরতা দেখিয়াই হউক, বাঁশী যখন স্বীকার করিল যে, এবারে সে আর পলাইবে না, শাস্ত সুবোধ ছেলেটির মত দিদির আদেশ পালন করিবে, তখন তাহার এই স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পার্শ্বতী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ দিদি, সরকার মশাইও তাহ’লে আসবে বোধ হয়?”

পার্কী বলিল, “কি জানি, আসতেও পারে।”

বাণী বলিল, “আসতে পারে কেন, আসতেই হবে তাকে। নইলে ভ্রলোকদের সঙ্গে নিয়ে আসবে কে?”

মুখ গচ্কাইয়া পার্কী বলিল, “হাঁ, সেই জন্তেও আসতে পারে।”

সহাস্রমুখে বাণী বলিল, “সরকার মশাই কিন্তু বেশ লোক, দিদি। সেদিন রাস্তায় আমাকে ধ’রে বসলো, চল আমাদের বাড়ী।”

একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্কী জিজ্ঞাসা করিল, “তুই কি বল্গি?”

বাণী বলিল, “আমি বল্‌ম, দিদিকে জিজ্ঞাসা ক’রে যাব।”

“বেশ বলেছি” বলিয়া পার্কী রুইমাছটার মুণ্ডচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল।

বাণী বলিল, “আমি কিন্তু সরকার মশায়ের সঙ্গে একবার ওদের বাড়ীতে যাব।”

তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে পার্কী বলিল, “গিয়ে কি হবে?”

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বাণী বলিল, “হবে আবার কি? এমনি কুটুমবাড়ীতে কি কেউ যায় না?”

আমীর ঘর

তর্জনসহকারে পার্শ্বতী বলিল, “ভারী তো কুটুম। না না, ওখানে তোর কুটুমিতে হস্তে যাওয়া হবে না।”

ঈশ্বর হাসিয়া বাণী বলিল, “আচ্ছা দিদি, ওদের ওপর তোমার এত বাগ কেন? সরকার মশায় আবার বিয়ে ক’রেছে ব’লে, না?”

ক্রকুটি করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “হাঁ, বিয়ে ক’রেছে ব’লে! কক্ক না সে বিয়ে, তাতে আমার কি?”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বাণী বলিল, “তা দিদি, সরকার মশায় বিয়ে ক’রে ভালই ক’রেছে, নইলে তোমাকে তো ওখানে নিয়ে যেতো।”

বাণীর কথায় পার্শ্বতীর হাসি আসিল, বলিল, “তা বৈ কি, আমাকে নিয়ে গেলে তোকে রোঁধে দিত কে? ওঃ, এই জন্তেই সরকার মশায়ের ওপর তোর এত ভক্তি না?”

বাণী বলিল, “না না, তা কেন? সরকার মশায়ের কথাগুলি বেশ মিষ্টি কি না, তাই।”

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “তা ছাড়া তোর বিয়ের যোগাড় ক’রে দিচ্ছে।”

একটু লজ্জিতভাবে বাণী বলিল, “হাঁ, বিয়ের তরে তো আমি কেঁদে বেড়াচ্ছি। না দিদি, তুমি যাই বল, সরকার মশায় লোকটি বেশ ভাল।”

সহাস্তমুখে তাহাকে ধমক দিয়া পার্শ্বতী বলিল, “আচ্ছা আচ্ছা, ভাল তো ভাল, আমিই কি মন্দ বলছি?”

বাণী ধীরে ধীরে বলিল, “হাঁ দিদি, তুমি কি আর কক্কখনো ওখানে যাবে না?”

পার্ক। কোন্‌খানে?

স্বামীর ঘর

বাণী। কোন্‌খানে আবার ? সরকার মশায়ের বাড়ীতে ।

পার্কী। সেখানে যাবার আমার দরকার কি ?

খুব আশ্চর্যের ভাব দেখাইয়া বাণী বলিল, “বাঃ রে, শশুরবাড়ী যাবার দরকার নাই ?”

গভীরমুখে পার্কীতী বলিল, “দরকার থাকলে অনেকদিনই চ’লে যেতাম ।”

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “তাহ’লে ককখনো যাবে না বল ।”

উদগত নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া পার্কীতী বলিল, “তুই যদি কখনো তাড়িয়ে দিস, তহ’লে যেতেও পারি ।”

বিস্ময়ের সহিত বাণী বলিল, “আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে যাব কেন, দিদি ?”

সর্বনাশ ! পার্কীতী কি বলিয়া ফেলিল ? আর একদিন স্নেহের আব্দারচ্ছলে ঐরূপ কথা বলিয়া সে কি নাকাল হইয়াছে, দিদিগতপ্রাণ বাণী, দিদির লাঞ্ছনার আশঙ্কায় বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া কি কাণ্ডই না করিয়াছে ! পার্কীতী আজ আবার সেইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বাণীর ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা করিতে বসিয়াছে । আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাস্ততরলকণ্ঠে বলিল, “কেন তাড়িয়ে দিতে যাবি, তা তুই-ই জানিস্ । কেন, আজ সকালেই তো আমার মাথা ফাটিয়ে দিবি ব’লে লাঠি ভুলে রাখ’লি ।”

উচ্চহাসি হাসিয়া বাণী বলিল, “ও হরি, সেই লাঠি দেপে বুঝি তোমার ভয় হ’য়েছে ?”

মুখে একটু শঙ্কার ভাব আনিয়া পার্কীতী বলিল, “তা ভয় হবে না ; অত বড় লাঠি !”

আমীর খান

হাসিতে হাসিতে বাণী বলিল, “যত বড় লাঠিই হোক, তোমার মাথায় ও লাঠি পড়বে না দিদি।”

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন পড়বে না?”

সতেজকণ্ঠে বাণী বলিল, “কেন কি? তোমার মাথায় লাঠি পড়বে? তুমি যে দিদি।”

স্নেহসজ্জলদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আদ্রকণ্ঠে পার্বতী বলিল, “দিদি ব’লে তাই বুঝি দিদির কথা এত রাখিস?”

বাণী বলিল, “কেন, তোমার কোন্ কথাটা রাখি না, শুনি?”

মৃদুহাস্তসহকারে পার্বতী বলিল, “রাখিস বৈ কি, আমার কথা রাখলে এন্দিন কবে বিয়ে হয়ে যেতো।”

বাণী বলিল, “তা কবে না হোক, এখন তো হচ্ছে।”

পার্বতী বলিল, “হচ্ছে বটে, কিন্তু যতদিন না হ’য়ে যায়, ততদিন তোকে বিশ্বাস নাই।”

ঈষৎ হাসিয়া বাণী বলিল, “না দিদি, এবারে আর আমি অবিশ্বাসী হব না। এর মধ্যে সরকার মশায় আছে।”

কৃত্রিম কোপে ভ্রূয়ুগল কুঞ্চিত করিয়া পার্বতী বলিল, “তাহ’লে সরকার মশায়ের খাতিরেই বিয়ে কচ্চিস্ বল, আমার উপরোধে নয়।”

মাথা নাড়িয়া বাণী বলিল, “তা কেন, তোমার উপরোধেও বটে আর সরকার মশায়ের খাতিরেও বটে।”

পার্বতী বলিল, “তা যার খাতিরেই হোক, বিয়েটা এখন চুকে গেলে হয়।”

সহাস্তে বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা দিদি, আমার বিয়ে হ’লে

আমীর খান

তোমার কি আর ছ'টো হাত বেরবে না তোমার ভরে আকাশ থেকে
পুষ্পক-রথ নেমে আসবে ?”

পার্কভী সহসা যেন গর্জিয়া উঠিল; গাঢ় প্রদীপ্তকণ্ঠে বলিল,
“আমার কি হবে না হবে তুই যদি তা বুঝতিসু বাণী, তাহ'লে এদিন
কখনো এমন কত্তে পারতিসু না। বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী কত্তে
পারিলে আমার আর ছ'টো হাতও বেরবে না, পুষ্পক-রথও নেমে
আসবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, তোর এই বিয়ের সঙ্গে যেন
আমার জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ জড়িয়ে রয়েছে, তুই সংসারী হ'লে
স্বাধীন হ'লে অজ্ঞান জীবনের দুঃখ-কষ্ট যা কিছু, সব যেন সার্থক হ'য়ে
যাবে।”

স্নেহের উচ্ছ্বাসে পার্কভীর মুখখানা যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। বাণী
নিঃশব্দ-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার সেই গর্কোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া
রহিল।

এমন সময় চানরখানা কাঁধে ফেনিয়া চটা জুতার ফটুফটু শব্দ করিতে
করিতে কালচাঁদ বাণী চুকিয়া ডাকিল, “বাণী কোথায় হে, ওহে
বাণী ?”

“এই যে সরকার মশাই” বলিয়া বাণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল, এবং
তাড়াতাড়ি দাবাব উপর একখানা আসন পাতিয়া দিল। পার্কভী
আস্তে-বাস্তে বাঁ-হাতের উল্টা পিঠে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া
মাছগুলা চুপড়ীতে তুলিতে ব্যস্ত হইল।

কালচাঁদ বাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “শুধু আমাকে দিলে চলবে
না, বাইরে ছ'জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের আগে আসন
দিয়ে এস।”

আমার ঘর

বাশী একখানা সতরঞ্জি নইয়া ভদ্রলোকদের আসন দিতে চলিল। কালাচাঁদ সচকিতভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “না হে না, তোমার গিয়ে কাজ নাই, আমাকে দাও। তুমি যে বর।”

বলিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বাশীর হাত হইতে সতরঞ্জিখানা নইয়া বাহিরে চলিল, যাইতে যাইতে বাশীকে তামাক প্রস্তুত করিতে বলিয়া গেল।

ভদ্রলোকদের আসন ও তামাক দিয়া আসিয়া কালাচাঁদ পার্কর্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ওঁদের জনখাবারের কি হ’য়েছে?”

মুহূৰ্ত্তে পার্কর্তী বলিল, “ওঁদের তরে মোহনভোগ তৈরী ক’রেছি, আর দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়া রেখেছি।”

সহাস্তে কালাচাঁদ বলিল, “ওঁদের তরে তো এই ব্যবস্থা, কিন্তু আমান তরে কি হ’য়েছে?”

চাপা হাসির সঙ্গে পার্কর্তী উত্তর দিল, “গুড-মুড়ি।”

হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদ বলিল, “মন্দ কি, আমরা চামাড়ুবা মাছুষ, গুড-মুড়িই আমাদের প্রধান খাদ্য।”

পার্কর্তী বলিল, “সেই জন্তেই তো এই প্রধান খাদ্যের যোগাড় ক’বে রেখেছি।”

কালাচাঁদ বলিল, “বেশ ক’রেছ! এখন যা হয় কত্তে পার, কিন্তু খটক বিদায়ের সময় একটু ভালরকম নেকুনজরটা রেখো।”

পার্কর্তী। তা রাখবো, তবে সে বিদায় খটকঠাকুরের পছন্দ হ’লে হয়।

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, “গলাধাক্কা না কি? তা সে

আমীর খয়র

বিদায় তো অনেক আগেই পেয়েছি। দোহাই পার্কতী, ওটা ছাড়।
আর অন্য কিছু নতুন রকম বিদায় থাকে তো দিও।”

হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদ বাহিরে চলিয়া গেল। পার্কতী
নতমুখে গম্ভীরভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকদের জলখাবার সাজাইতে
থাকিল।

পাত্র মনোনীত হওয়ায় আশীর্বাদ সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন
কালাচাঁদ নিজে গিয়া মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া আসিল। সেই সঙ্গে
দিনস্থিও হইয়া গেল। পার্কতীব ব্যক্ততায় খুব তাড়াতাড়িই দিনস্থির
করিতে হইল।

এ বিবাহে কালাচাঁদ শুধু ঘটক নয়, তাহাকে বরকর্তাও সাজিতে
হইল এবং তাহাব উদ্যোগে ও পবিত্রমে নির্বিশেষে বিবাহকার্য সম্পন্ন
হইয়া গেল। বৌ দেখিয়া শুধু পার্কতী নয়, পাড়াপ্রতিবাসীরাও খুসী
হইল। হা, বোয়ের মত বৌ বটে, বৌ শুধু নামে লক্ষ্মী নয়, কাজে
কর্তব্যোও লক্ষ্মী বটে। যেমন রূপ, তেমনি গডন-পিটন, তেমনি কথা-
বার্তার ভঙ্গী। এমন মেয়ে হাজাবে একটা পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “বৌ পছন্দ
হয়েছে তো পার্কতী?”

পার্কতী কৃতজ্ঞতার সহিত প্রশংসার স্বরে বলিল, “তুমি যখন পছন্দ
ক’রে নিয়ে এসেছ, তখন কি আমার অপছন্দ হ’তে পারে?”

একটু স্নেহের সঙ্গে কালাচাঁদ বলিল, “তবু ভাল, আমার উপর এতটা
নির্ভর কত্তে পার তাহ’লে।”

পার্কতী বলিল, “কতকটা পারি বোধ হয়।”

কালাচাঁদ বলিল, “এবার ঘটকের প্রাপ্যটা মিটিয়ে দাও তাহ’লে।”

স্বামীর স্বপ্ন

“হাঁ, দিচ্ছি।” বলিয়া পার্শ্বতী উঠিয়া আসিল এবং গলায় আঁচল দিয়া কালাচাঁদের পায়ের কাছে মাথা নীচু করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিল। তারপর দাঁড়াইয়া সহাস্রমুখে বলিল, “কেমন, সন্তুষ্ট হ’লে তো?”

প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে কালাচাঁদ বলিল, “খুব সন্তুষ্ট হ’য়েছি, কিন্তু পার্শ্বতী।”

কালাচাঁদের সম্বোধনের স্বরটা যেন ভারী। সে সম্বোধনে পার্শ্বতী চমকিত হইয়া উত্তর দিল, “কি ব’লছ?”

গাঢ়কণ্ঠে কালাচাঁদ বলিল, “আমি তো সন্তুষ্ট হ’য়েই আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ভক্তি, এই শ্রদ্ধা, এই স্নেহ, এই প্রীতি—যা আমার অবশ্যপ্রাপ্য, তা হ’তে আমাকে বঞ্চিত ক’রে তুমি স্থগী হ’য়ে—সন্তুষ্ট হ’য়ে আছ কি?”

পার্শ্বতীর বৃকের ভিতরটায় কেমন করিয়া উঠিল। যেন সপ্ত সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বৃকটী আলোড়িত হইতে থাকিল। এতদিন সে যে কান্নাটাকে বৃকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, মুক্তমুখ-প্রশ্রবণের জ্বায় সহসা তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বাষ্পগদগদকণ্ঠে নিতান্ত কাতরভাবে পার্শ্বতী বলিল, “আমি—আমি তোমাকে কোন কথা বলতে পারবো না।”

পার্শ্বতীর দুই চোখ দিয়া হ হ করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। সে ধাবার বেগ কিছুতেই রোধ করিতে না পারিয়া সে স্বামীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল। কালাচাঁদ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং সেইদিনই সে ছাতা চাদর লইয়া বাড়ী রওনা হইল।

আমীর ঘর

বাঁশী বলিল, “আজই যে চ’লে যাচ্চো, সরকার মশায় ?”

কালচাঁদ বলিল, “কি ক’রবো ভাই, আজ পাঁচ সাতদিন বাড়ী ছাড়া, বাড়ীতে কাজকর্ম আছে।”

কালচাঁদ চলিয়া গেলে বাঁশী আসিয়া পার্করতীকে বলিল, “সরকার মশায় আজই চ’লে গেল, আর দুদিন রইল না, দিদি ?”

রুম্বকণ্ঠে পার্করতী উত্তর করিল, “কাজ চুকে গেল, আর থেকে কি করবে ? ব’সে ব’সে কুটুন্নিতা পাকাবে নাকি !”

দিদির চড়া উত্তর শুনিয়া বাঁশী ক্ষেম হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

“বামুন দাদা !”

“কেন গা পার্করতি ?”

“এই কোণ্ডী হু’খানা দেখ তো।”

দামোদর শর্মা পাজীখানা মুড়িয়া রাখিয়া চশমাটা ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেন, তারপর সেটা চোখে লাগাইয়া একখানা কোণ্ডীর ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “এটা তো বাঁশীর কোণ্ডী।”

পার্করতী বলিল, “আর ছোটখানা, বৌয়ের।”

“কি দেখতে হবে ?”

“দেখে দাও, হু’জনে বনিবনাও হচ্ছে না কেন ? ওদের মিলের ঘরে কি দোষ আছে।”

আমীর খয়র

‘ছ’খানা কোণী খুলিয়া লগ্নচক্র দেখিয়া দামোদর শশ্মা বলিলেন, “দোষ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না বরং মিল হবারই কথা, কেননা, রাজঘোটক দেখতে পাচ্ছি।”

চিন্তিতভাবে পার্শ্বতী বলিল, “তাহ’লে এমন হ’চ্ছে কেন বামুন-দাদা ?”

বামুন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হ’চ্ছে ? ছ’জনে ঝগড়াঝাটি হয় না কি ?”

পার্শ্বতী বলিল, “ঝগড়াঝাটি যে হয় তা নয়, তবে বাঁশী যেন বোটাঁকে দেখতে পারে না।”

অদূরে বসিয়া বামুনদিদি চাউল বাছিতেছিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া সহাস্তমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাত্রে-ধত্রে যায় না কি ?”

পার্শ্বতী বলিল, “তা যায় না, তবে কি জ্ঞান বামুনদিদি, বোয়ের উপর যেন বেজার। কাছে গেলে খিটখিট করে, পান-জল দিলে বিরক্ত হয়।”

ঈষৎ হাসিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “অমন হয়—হয়, এর জন্তে ভাবনা নাই। এর পর বোয়ের বয়স হ’লে দেখবে, এসব আর থাকবে না।”

আশ্বস্তভাবে পার্শ্বতী বলিল, “তাই বল দিদি, তাই যেন হয়, তোমাদের ব্রাহ্মণের মেয়ের কথাই যেন ফলে। আমার সাধ কি জ্ঞান বামুনদিদি, ছ’টিতে বেশ হাসবে, খেলবে, আমোদ আহ্লাদে থাকবে দেখে আমার চক্ষু জুড়াবে। আমার আর সুখ-সম্মান কি আছে বামুনদিদি, এখন ওরাই তো আমার সব। ওদের সুখী হ’তে দেখলেই আমার সুখ।”

স্বামীর ঘর

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া সহানুভূতি-স্বরে বামুনদিদি বলিলেন, “তা বৈ কি, ঐ ভায়ের জগ্গেই তো আজ তোমার এই দশা ! তেমন রাক্ষসের রান্না ভাগ ক’বে ভাইটিকে নিয়ে এখানে প’ড়ে বয়েছ। ধন্তি মেয়ে যাহোক তুমি। তবু আপন ভাই নয়, খুড়োব ছেলে।”

পার্কীতী বলিল, “আমি তো তা মনে কবি না দিদি, আমি মা’ব পেটেব আপন ভাই ব’লেই জানি, বাশীও ঠিক তাই ভাবে। তা আপনই হোক আর পবই হোক, আশীর্বাদ কর ওদের সুখী দেখে যেন মত্তে পারি। তাহ’লে আমার সকল কষ্ট সার্থক হবে।”

পার্কীতীর চোপ দুইটা যেন ছলছল করিতে লাগিল। বামুনদিদি মন্তকসঞ্চালনেব সহিত নাসাবিনশিত স্বরুহং নথটাকে আন্দোলিত কবিয়া পার্কীতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তা হবে পার্কীতী, তা হবে। এখন ঐ যে দেখ্ছো খিটনিটা, দিনকতক পবে দেখ্বে, ওসকল কিছুই নাই, ছ’জনে এমন মিল হ’য়ে গিয়েছে যে, এক গলায় জল ঢাললে আর একজনর গলায় পড়বে। তখন আবার এই যে তুমি ওদের জন্তে এত ভাব্ছো, তুমিই হ’য়ে যাবে পব। আমাদের ঠাকুরপোকেও তো ঐ বকন ক’ত দেখেছি, ছোটবৌ কাছে গেলে যেন মাতে আস্তো, ঐ নিচে কতদিন আমায় সঙ্গে ঠাকুরপোব ঝগড়া পযাস্ত হ’য়ে গিয়েছে। তোমার বামুনদাদা তো ভেবেই আকুল। আমি বলতুম, ওগো থাম থাম, দিনকতক যেতে দাও।”

বলিয়া তিনি স্বামীর দিকে সহাস্তে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে বামুনদাদাও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূ হাসিলেন। বামুনদিদি বলিতে লাগিলেন, “তারপর সেই ছোটবৌ বেশ বড়-সড় হ’য়ে উঠলে ছ’জনে এমন ভাব হ’লো যে, তখন ছোটবৌকে একটা কথা বললে ঠাকুরপো

স্বামীর ঘর

তেড়ে মাস্তে আসতো। সংসারে একটু বেশী খাটতে দেখলে বাগে কস্কস্ কস্তো। তখন বৌ হ'লো আপন, আমরা হ'লাম পব। শত্রুর মুখে ছাই নিয়ে আমার তখন বাড়-বাড়ন্ত সংসার, তিন মেয়ে দুই ছেলে। সংসারে খাটুনি তো কম ছিল না। দেখে শুনে ঠাকুবপো আলাদা হ'য়ে পড়লো। তাই বলছি, তোমার ভয় নাই, এর পব দেখবে ঐ বাঁশী বোয়ের গোলাম হ'য়ে গিয়েছে, তুমি তখন একটা কথা বললে, মুখে কিছু না বলুক রাগে গুম হ'য়ে থাকবে।”

ঈশ্বর শক্তিতাবে পার্শ্বতী বলিল, “না, বাঁশী তেমন ছেনেই নয়, ও দিদি ভিন্ন আর কিছু জানে না।”

তাহাকে প্রবোধ দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “তা হবে না? কত কষ্টে তুমি মানুষ করেছ ওকে। তাই হোক, ভগবান করুন ওদেব স্থখী দেখে তুমি স্থখী হও।”

গদগদকণ্ঠে পার্শ্বতী বলিল, “আশীর্বাদ কর দিদি, তোমাদের আশীর্বাদই আমার ভবসা। তা নইলে ঐ মা-বাপ-মরা ছেলে যে মানুষ হবে, বিয়ে-থা দিয়ে ওকে যে আবাব সংসারী কস্তে পারবো, এ আশা কি একদিনও কবেছিলাম।”

অতঃপর সে বামুনদাদাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তা' হলে বামুনদাদা, কোণ্ঠিতে দোষ কিছু নাই?”

কোণ্ঠী দুইটা ভাঁজ করিতে করিতে বামুনদাদা বলিলেন, “না না, দোষ কিছু নাই, ববং উভয়ের পতি-পত্নীস্থানে শুভগ্রহেরই দৃষ্টি রয়েছে।”

কোণ্ঠী দুইখানা লইয়া বামুনদাদা ও বামুনদিদিকে প্রণাম কর পার্শ্বতী হুটুটিতে গ্রহান করিল। বামুনদিদি তখন স্বামীকে সম্বোধন

স্বামীর ঘর

করিয়া বলিলেন, “আহা, ছুঁড়ীটা ভাই-ভাই ক’রেই সারা হ’য়ে গেল, অমন স্বামীকে পর্যাপ্ত ত্যাগ করলে। শেষে কিছু কষ্ট না পায়!”

বামুনদাদা বলিলেন, “না, কষ্ট পাবে কেন? বাঁশী তেমন ছেলে নয়।”

মুখ মচ্কাইয়া বামুনদিদি বলিলেন, “বাঁশী তেমন ছেলে নয় জানি, কিন্তু সে কি করবে? কথাতেই আছে, ‘ভায়ের ভাত ভাজেব হাত।’ বৌটার সঙ্গে বনিবনাও হ’চ্ছে তো?”

সহাস্রমুখে বামুনদাদা বলিলেন, “নিজে ভাল হ’লে সকলের সঙ্গেই বনিবনাও হয়।”

রোষগস্তীবমুখে বামুনদিদি বলিলেন, “তাহ’লে কি তুমি বলতে চাও যে, আমি মন্দ বলেই ছোটবোয়ের সঙ্গে আমার বনিবনাও হ’লো না?”

অপ্রতিভভাবে বামুনদাদা বলিলেন, “পাগল। আমি কি তোমার কথা বলছি। জগতে সকল মেয়েমানুষই তো বৌমার মত ছোটলোকের মেয়ে নয়।”

বামুনদিদি বলিলেন, “কে ছোটলোকের মেয়ে কে ডাল্লোকের মেয়ে ব্যাভার না করলে তো জানা যায় না, বৌটা যদি ঐ রকমই হয়।”

“হয়, পার্শ্বতী কষ্ট পাবে, তোমার আমার তাতে কি বল।” বলিয়া বামুনদাদা আপাততঃ গৃহিণীব জেরা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হুঁকা-কলিকা লইয়া ধূমপানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। অগত্যা বামুনদিদি পুনরায় নতমুখে নিঃশব্দে চাউল বাছিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “কাল না তোমার জ্বর হ’য়েছিল, দিদি ?”

তাচ্ছিল্যসূচক স্বরে পার্শ্বতী বলিল, “হ’য়েছিল একটু জ্বর। তার হ’য়েছে কি !”

একটু রাগতভাবে বাঁশী বলিল, “হয়নি কিছু, তবে কাল জ্বর হ’য়েছিল, কিছু খাওনি, তাই আজ সকালে উঠেই ঘরের কাজ আরম্ভ করেছ।”

মৃদু হাসিয়া পার্শ্বতী বলিল, “তা জ্বর হ’য়েছিল ব’লে কাজ করবো না ? কাজকর্ম সব প’ড়ে থাকবে ?”

গম্ভীরমুখে বাঁশী বলিল, “প’ড়ে থাকবে কেন ?”

পার্ক। তবে করবে কে ?

বাঁশী। কেন, কাজ করবার আর কি লোক নাই ?

যেন একটু বিশ্বয়ের সহিত বাঁশীর মুখের দিকে চাহিয়া পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “লোক আর কে আছে রে ! বৌ ?”

গম্ভীরকণ্ঠে বাঁশী বলিল, “কেন, সে কি কাজকর্ম কিছুই কণ্ঠে পারে না ?”

পার্কতী হাসিয়া উঠিল, “কেন পারবে না, খুব পারবে। বল না তাকে, এন্টুনি সে পাটকাট সেরে তোকে রেঁধে ভাত দেবে।”

গম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, “দেবে না তো করবে কি ?”

পার্ক। তুই কি কচ্চিস ?

স্বামী'র ঘর

বাঁশী । আমি ব্যাটা'ছেলে, আমি কি এসব কাজ কত্তে পারি ?

পার্কী । তুই উনিশ বছরের বুডো, তুই পারিস্ না, আর চোদ্দ বছরের মেয়ে কত্তে পারবে ?

বাঁশী । কেন পারবে না ? মুখ্যোদের নলি এগার বছরের মেয়ে , সে কত কাজ করে জান ?

পার্কী । জানি । মিত্তিরদের চাকু ষোল বছরের ছেলে , সে উপায় ক'বে সংসার চালাচ্ছে, তুই পাবিস্ না কেন বলতো ?

এই কঠিন প্রশ্নেব উত্তর দিতে না পারিয়া বাঁশী কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বহিল । তাবপর একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, “তাহ'লে তুমি কি ওকে দিয়ে কাজকর্ম কিছু কবাবে না ?”

পার্কীতী বলিল, “ওব যখন কাজকর্ম করবার বয়স হবে, তখন নিজেই করবে, আমাকে করাতে হবে না ।”

ক্রুদ্ধভাবে বাঁশী বলিল, “ততদিন কেবল পটেব পুতুলের মত ব'সে থাকবে ?”

তর্জনসহকারে পার্কীতী বলিল, “হাঁ, থাকবে, তোর তাতে কি বল তো ?”

জ্ঞ হুঙ্কিত করিয়া বাঁশী বলিল, “বেশ, তাই থাক্ আর তুমি জরে ধুঁকে-ধুঁকে কাজ কর । আমার তাতে ক্ষতি কি ?”

পার্কীতী বলিল, “তবে তুই যেমন আছিস্, তেমনি থাক্, তোকে এত মোডলী কত্তে কেউ বলে না ।”

“বেশ” বলিয়া বাঁশী মুখ সিটকাইয়া ঝড়নীতে সূতা পরাইতে লাগিল ।

পার্কীতী ডাকিল, “হাঁ রে বাঁশি !”

স্বামীর ঘর

গম্ভীরভাবে বাঁশী উত্তর দিল, “কেন ?”

সহাস্ত্রে পার্শ্বতী বলিল, “আচ্ছা, চিরকালই তো আমার অন্তঃ হ’তো, জরে ধুঁকে-ধুঁকে আমাকে কাজকর্ম কত্তে হ’তো। কিন্তু কৈ, তখন তো এত দবদ দেখিয়ে কাজ কত্তে আমাকে বারণ কত্তিস্ না ?”

বাঁশী নীরবে গম্ভীরভাবে বসিয়া বঁড়শী দুইটা ঠিক সময়ত্রে গ্রথিত হইয়াছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। পার্শ্বতী বলিল, “তখন বৌ ছিল না, তাই কিছু বলিস্ নাই, এখন বৌ হ’য়েছে কি না। এখন পাছে আমি মনে করি, আমি কাজ কচ্চি, বৌ ব’সে রয়েছে, তবু বাঁশী কিছু বলে না, এই ভেবেই বলতে এসেছিস্, না ?”

ক্রোধগম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, “হাঁ, তাই বলতে এসেছি, আর বলতে এসে আমি ঝক্কারি করেছি।”

পার্শ্বতী বলিল, “ঝক্কারি একবার নয়—দু’শোবার, হাজারবার।”

বাঁশী রাগে-বাগে বঁড়শী-সূতা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পার্শ্বতী আপন মনে হাসিয়া ডাকিল, “বৌ, ও বৌ ?”

সাদা না পাইয়া ঘরের দরজাব কাছে গিয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “বৌ, ওলো বৌ ? ওমা এখনো শুয়ে আছিস্ ? উঠে দেখ্ দেখি, বেলা কতখানি হ’য়েছে !”

লক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “এত বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে আছিস্ কেন ?”

বিরক্তসূচক মুখভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মী উত্তর করিল, “ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলাম তাই শুয়ে আছি।”

পার্শ্বতী তাহার এই বিরক্তিটুকু লক্ষ্য করিলেও তাহাতে যেন দৃক-পাত না করিয়া সহাস্ত্রে বলিল, “ঘুমিয়ে পড়িস্ না তো আমি কি বলছি

স্বামীৰ ঘৰ

জেগে উঠে আছিল? কিন্তু গেরস্তঘরের বৌঝিদের এত বেলা পর্যন্ত ঘুম ভাল কি?”

ভারীমুখে লক্ষ্মী বলিল, “ভালই হোক, মন্দই হোক, চোখে ঘুম এলে তাকে আটক ক’রে রাখবো না কি?”

পার্কতী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, “তা রাখতে হয় বৈ কি। মেয়ে মাহুঘের এত ঘুম কি ভাল? ধব, আজ আমি যেন কাজকর্ম কচ্ছি, কিন্তু আমি যদি দু’দিন না পারি, তখন কি হবে?”

ক্রভঙ্গী কবিয়া লক্ষ্মী বলিল, “যা হয় হবে, তা ব’লে ভোব-ভোর উঠে আমি কাজ কত্তে পাবো না। সকালে একটু না ঘুমুলে আমার মাথা ধরে।”

পার্কতী বিষয়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী আলস্ত ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহির হইল।

বৌয়ের জবাবটা পার্কতীর কাণে যেন বডই বিসদৃশ ঠেকিল। লক্ষ্মী আজ একমাস আসিয়াছে, কিন্তু এমন কড়া জবাব দূরে থাক, সাতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও একটা কথার উত্তর পাওয়া যাইত না। উত্তর যাহা দিত তাহা অতি মৃদু, যেন কত লজ্জা ও শঙ্কায় পূর্ণ। তাঁহা অহেতুক লজ্জা ও সঙ্কোচের জন্ত পার্কতী কত বিরক্ত হইয়াছে, এই অস্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিবার জন্ত তাহাকে কত উপদেশ দিয়াছে, কত তিরস্কার করিয়াছে এবং সে উপদেশ তিরস্কারে কোন ফল না হওয়ায় পরিহাস করিয়া “বোবা বো” নাম দিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মুখে এরূপ প্রগল্ভ উত্তর শ্রবণে পার্কতী শুধু আশ্চর্য্যাবিত হইল না, একটু চিন্তিত হইল। মনটাও যেন একটু ভারী হইয়া আসিল।

স্বামীর স্বপ্ন

তবে তাহার এ চিন্তাটা বেশীক্ষণ রহিল না। কথাটা লইয়া খানিকক্ষণ মনের ভিতর তোলাপাড়া করিবার পর পার্কীতী স্থির কবিতা লইল, এটা ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নহে। বাপ-মায়ের আদরে মেয়ে,—পবের ঘরে নূতন আসিয়া সকলকে পর ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে কথাবার্তা কহিত, এখন ক্রমে আপন ভাবিয়া লইয়াছে বলিয়াই মনের কথা মুখে অসকোচে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেমানুষের এই সঙ্কোচশূন্য আব্দারের কথাটা লইয়া মনের ভিতর এতক্ষণ তোলাপাড়া কবাই নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে! ছি ছি, ইহাকেই বলে মনের পাপ!

চিন্তাটাকে ত্যাগ করিয়া পার্কীতী স্বচ্ছন্দমনে পূর্নরায় গৃহকন্ঠে ব্যাপ্ত হইল।

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া লক্ষ্মী দাবার উপর পা বুলাইয়া বসিল এবং পার্কীতীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন আমাকে ডাকছিলে ঠাকুরঝি?”

পার্কীতী বলিল, “ডাকছিলাম, বলি সকাল বেলা দু’ একটা কাজকর্ম দেখে শুনে কর না।”

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “কি কাজ করবো?”

পার্কীতীর এবার একটু রাগ হইল। চোদ্দ বছরের খুবড়ো মেয়ে, যেন কিছুই জানে না, কচি খুকী। বলিল, “সংসারের যা কাজ, তাই দেখে শুনে করবি। কাল থেকে আমার জর হ’য়েছে, খাওয়া নাই, কাজ কত্তে গেলে পা-হাত যেন ঝিম্ঝিম্ করে।—তা ছাড়া আমাকে কাজ কত্তে দেখে বাঁশী রাগ কত্তে লাগলো।”

ভারীমুখে লক্ষ্মী বলিল, “তা এত রাগারাগির দরকার কি? তুমি না পার ব’সে থাক আমি সব কচ্চি।”

আমীর ঘর

পার্বতী বলিল, “আমি কি তোকে সব কাজই কহে বলছি, না আমি তোমার কাজের ভরসাই করি ?”

একটু বিবেচনা করিয়া, পরে লক্ষ্মী বলিল, “বলুছোঁ, অথচ বল না, এ তোমার কেমন কথা ঠাকুরঝি।”

পার্বতী অবাক। বোঁ বলে কি ? ইহা কি ছেনেমাছমের কথা ! সে বিশ্ববিশ্ফারিত দৃষ্টিতে বোয়ের অকুটিল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী বসিয়াছিল, হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া পার্বতীব হাত হইতে ঝাঁটাটা ছিনাইয়া লইয়া উঠান ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল। রাগে যেন ফুলিতে ফুলিতে পার্বতী ডাকিল, “বোঁ ?”

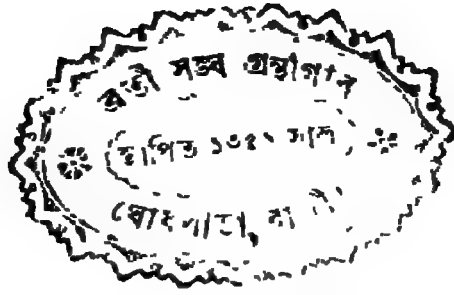
লক্ষ্মী মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, “কেন ?”

“পার্বি সব কাজ কহে ?”

“যতদূর পারি করুবোঁ।”

গর্জন করিয়া পার্বতী বলিল, “যতদূর নয়——”

আর বলা হইল না, বাঁশী সিস্ টানিতে টানিতে বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পার্বতী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাবা হইতে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া খিড়কী-ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

“মাষ্টার !”

“কেন হে বংশীবদন ?”

বেণী মাষ্টার খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল। একটু অপ্রতিভভাবে বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “হাসলে যে বড ?”

বেণী বলিল, “নেহাং নির্কোধের মত তোমার প্রশ্নটা শুনে।”

মুখ ভার করিয়া বাণী বলিল, “তোমার কাছে জগৎশুদ্ধ লোকই যে নির্কোধ তা আমি জানি, কিন্তু আমার প্রশ্নটা নির্কোধের মত হ’লো কিসে শুনি ?”

গম্ভীরভাবে বেণী বলিল, “তোমার প্রশ্ন খুব নির্কোধের মতই হ’য়েছে। একজন আকাট মূর্খ যার কিছুমাত্র সেল্ নাই, সেও এমন ওয়াণ্ডারফুল প্রশ্ন করতে পারে না।”

প্রশ্নটা কিসে যে এমন মন্দ হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বাণী হতবুদ্ধির তার মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেণী একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, “ভূমি পাগল। বোয়ের সঙ্গে বোনের তুলনা ? তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, “বৌ বড না এই ব্রহ্মাণ্ডটা বড।”

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “ভাল, এ হু’য়ের বড কোন্টা ?”

বেণী বলিল, “বড় হচ্ছে, বৌ। বৌএর কাছে ব্রহ্মাণ্ডটাও অতি

আমীর ঘর

তুচ্ছ। শাস্ত্রেই আছে, ‘জীরত্বং দুষ্কৃনাদপি।’ অর্থাৎ জগতের মধ্যে জী হচ্ছে একটি রত্নস্বরূপ।”

একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বাণী বলিল, “বল কি মাষ্টার, জী এত বড় জিনিষ?”

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, “এমন জিনিষ দুনিয়া আর নাই হে বংশীবদন, এ জিনিষ দুনিয়া-ছাড়া। মা-বাপ এত পূজনীয় কিন্তু জীর স্থান তাঁদের অপেক্ষা অনেক উচ্ছে। দেখ না, ইংরাজের বিয়ে হ’লেই মা-বাপের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।”

একটু প্লেমের হাসি হাসিয়া বাণী বলিল, “তাই বুঝি তুমি বিয়ের আগেই বাপের সঙ্গে আলাদা হ’য়েছ?”

মুখখানাকে বিজ্ঞের ভাষা গম্ভীর করিয়া বেণী বলিল, “আমার কথা ছেড়ে দাও। মা মারা যাওয়ার পর বাবা যেদিন পুনরায় বিবাহ ক’রেছেন সেইদিন হ’তেই তিনি ছেলের কাছে প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির দাবী হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর প্রতি এখন আমার কোন কর্তব্যই নাই। এখন আমি স্বাধীন।”

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু কৈ, বিয়ে তো তুমি করলে না। সংসারের সেরা রত্ন যে জী—সে রত্ন হ’তে বঞ্চিত র’য়েছ কেন?”

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্নানমুখে বেণী বলিল, “কেন র’য়েছি তা তুমি কি জানবে বাণী। সে রত্নকে বাস্তব স্থান আমার নাই।”

বাণী। স্থান নেই কেন? তুমি গাছতলায় র’য়েছ নাকি?

বেণী। ঘরের চেয়ে গাছতলাও আমার পক্ষে শাস্তিদায়ক। আমার ‘যথারণ্যং তথা গৃহং। ঐ ড্যাম্ ফুল্ বুডো পিসী থাকতে আমি বিয়ে

আমীর স্বর

কস্তে পারবো না। ক'রে কি করবো? “নলিনীরে অগ্নিকুণ্ডে করিব
নিষ্ক্ষেপ?”

বাঁশী। বুড়ো পিসীর অপরাধ কি? তোমাকে ছ'বেলা রোঁধে
দেয়?

বেণী। রোঁধে দিলে কি হবে। দিনরাত ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌, প্যান্‌-প্যান্‌,
একদণ্ড বাতীতে টিকবার যো নাই। এই অশাস্তির আগুনে একটা
সরলা বালিকাকে নিষ্ক্ষেপ করবো, “তুমি কি আমাকে এতই নিষ্ঠুর মনে
কর বংশীবদন?”

যেন একটা গভীর বেদনায় বেণীর মুখখানা বিকৃত হইয়া আসিল।
বাঁশী বলিল, “আহা মাষ্টার, তুমি এ সব শিখলে কোথা
থেকে?”

বেণীর বেদনা-মলিন মুখে মৃদু-গভীর হাস্যরেখা প্রকটিত হইল,
বলিল, “এসব জানতে হ'লে পড়া-শোনা কস্তে হয়। দেখনি, এখনো
আমি কত রাত পর্যন্ত জেগে পড়া-শোনা করি?”

বাঁশী বলিল, “তা পড় বটে, কিন্তু সে সব ত নাটক-নভেল।”

বিজ্ঞের দ্বারা মন্তক সঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, “ওহে, পড়তে
জানলে ঐ সব নাটক-নভেলের ভিতর থেকেই কত বিষয় শিক্ষা করা
যায়। নাটক-নভেল কি তুচ্ছ বই নাকি? ধারা এই সব বই লেখেন,
তাঁদের বুঝি তুমি বাজে লোক মনে কর? তাঁরা এক একজন দিগ্‌গজ
পণ্ডিত। বঙ্কিমবাবুর নাম শুনেছ?”

ফাৎনাটা তখন একটু জোরে নড়িয়া উঠিয়াছিল, স্ততরাং বেণীর
জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অবসর বাঁশীর ছিল না; ফাৎনার উপর দৃষ্টিটাকে
স্থিরভাবে নিবদ্ধ করিয়া সে ছিপগাছটাকে তাডাতাড়ি বাগাইয়া

আমীর খয়র

ধরিল। বেণী এক-মুঠা কুঁড়া-মাখা ভাত লইয়া নিজের চারে ফেলিয়া দিল।

গোবর্দ্ধন ঘোষের ছেলে বেণী ঘোষ গ্রামের ছোকরা-মহলে সাধারণতঃ বেণী মাষ্টার নামে পরিচিত হইয়াছিল। বেণীমাষ্টার হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বিদায় লইয়া বেণী যখন মংসাসীকার বিদ্যায় পাবদর্শিতা লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তখন নিকটবর্তী মাঝের পাড়ায় মাইনর স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় স্কুলের সম্পাদক যতীনবাবুর সুপারিসে বেণী দশ টাকা বেতনে মাসকতক সেই পদে কাজ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মাষ্টার উপাধিটা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই পদ ছয় মাসের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে বসিয়া সিগারেট খাওয়া, ছেলেদের সঙ্গে হাস্ত-পরিহাস, তাহাদের জনখাবাবের পয়সা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি কতকগুলি সত্য-মিথ্যা অভিযোগে স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় তাহাকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন। চাকবী গেলেও কিন্তু তাহার মাষ্টার উপাধি গেল না, ছোকরা মহলে, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবদের নিকট সে বেণী মাষ্টার হইয়া রহিল।

তা বেণীর এই উপাধিটি যে একেবারেই নিরর্থক ছিল তাহা নহে। কথায় কথায় দুই একটা ইংরাজী বুকনি দিয়া, চাণক্য পণ্ডিত ও বিষ্ণুশর্মার সংস্কৃত বুলি আওড়াইয়া বেশ বিজ্ঞভাবে লোককে উপদেশ দিয়া সে স্বীয় মাষ্টার নামের মর্যাদা-রক্ষার চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টা সকল সময়ে যে সফল হইত তাহা নহে, তবে বহুদর্শী বিজ্ঞের দ্বারা সে নিজ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশে কোনদিনই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না।

বেণী মাষ্টারের সাংসারিক ইতিহাস একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ। চোন্দ পনের বৎসর বয়সে তাহার মা মারা গেলে বাপ গোবর্দ্ধন ঘোষ

আমীর ঘর

যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল, তখন হইতেই তাহার চিন্তা পিতার উপর বিজ্ঞপ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে বিমাতা আসিয়া যখন সংসারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল, তখন বিমাতার সেই কর্তৃত্ব বেগীর নিকট যেন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার ফলে তাহার বিমাতার সহিত, পিতার সহিত পদে পদে বিবাদ বাধিতে থাকিল, এবং এই বিবাদের পরিণামে বেগীকে প্রায়ই অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে নিতান্ত অনাথের জায় পথে পথে ঘুরিয়া দিন কাটাইতে হইল। অবাধ্য পুত্রের এই কষ্টে পিতার হৃদয় বিগলিত হইত কি না বলা যায় না, কিন্তু আর একজনের হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তিনি পিসীমা।

বিধবা হইবার পর হইতেই পিসীমা ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বেগীর জন্মের পর হইতেই তাহাকে সাতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন এক এক সময়ে বলিতেন, দিদির এই অতিরিক্ত ভালবাসাই বেগীর সর্বনাশ করিল, তাহাকে আব্দারে অবাধ্য করিয়া তুলিল, তাহার শিক্ষাভার পথে কাঁটা দিল। পিসীমা কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেন না। সবে ধন নীলমণি, সে আব্দার করিবে না তো করিবে কে? তাহাকে দিন রাত মার ধর করিলে সে বাঁচিবে কি? সে না বাঁচিলে সংসারে আর কি রহিল? আহা, ছুট হউক আব্দারে হউক, অবাধ্য অশান্ত মূর্খ হউক, বাঁচিয়া থাকুক সে। পিসীমার এই স্নেহচ্ছায়ায় বেগীর দুষ্টামি যে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিল।

এই স্নেহাঙ্ক পিসীমা, ভ্রাতার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বেগীর অনাদর

স্বামীর ঘর

ও অবস্থার আশঙ্কায় ভ্রাতার উপর সন্দেহ ছিলেন না। ইহার উপর তাঁহার আশঙ্কা যখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল, বেণীর কষ্টের সীমা রহিল না ; তখন তিনি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ‘যা থাকে কপালে’ বলিয়া বেণীর হাত ধরিয়া তিনি ভ্রাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাতে স্বামীর পয়সা কিছু সঞ্চিত ছিল। সেই পয়সায় নূতন ঘর বাধিয়া সেই ঘরে বেণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঞ্চিত পয়সাতেই দুইটা পেটের খরচ চলিতে থাকিল।

কিন্তু বসিয়া থাইলে সমুদ্রের বালি পর্যন্ত আঁটে না, এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা পিসীমা যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তখন তিনি উপার্জননের জন্ত বেণীকে তাড়া দিতে লাগিলেন। বেণীর কিছু মাছ ধরা, গুল্ল করা, নভেল পড়া ছাড়িয়া পরের চাকুরী স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পরে পিসীমার অবিরাম তাড়নায় তাহাও স্বীকার করিতে হইল, বেণী অনিচ্ছাসঙ্গেও স্থলের চাকুরী স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু সে চাকুরী ছয় মাসের বেশী স্থায়ী হইল না। এদিকে পিসীমার হাতে পয়সা যতই নিঃশেষ হইয়া আসিল, ততই তাঁহার চোখ ফুটিতে থাকিল। ভালবাসা পরে, পেট চলা আগে। বেণী কিছু সেজন্য একটুও চিন্তিত হইল না। পিসীমার লাঞ্ছনা, গল্পনা, উপদেশ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। পিসীমা এবার আপনার স্নেহের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন।

কিন্তু তখন শঙ্কা বৃথা। হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেলে পিসীমাকে বুড়া বয়সে স্ত্রীতা কাটিয়া, দোকানের ডাইল বাছিয়া, লোকের কাঁথা সেলাই করিয়া দিন চালাইতে হইল। আর বেণী টেডী কাটিয়া, মাছ ধরিয়া, নভেল পড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। যথা-সময়ে

স্বামীর ঘর

ভাত না পাইলে সে হাঁড়ী ভাজিতে মাইত, পিসীমা তিরস্কাব কবিলে তাঁহাকে প্রহার করিতে উত্তত হইত, গালি দিলে সন্ন্যাসী হইবার ভয় দেখাইত। অগত্যা পিসীমা নিজের পোড়া কপালে আগুন লাগাইয়া দিয়া কোন প্রকারে বেগীর খাওয়া পরার জন্ত দিনরাত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেন।

লোকে তাঁহাকে বলিত, “বেগীর পিসি। বেগীকে মানুষ করুলে, এখন তার মাথায় এক গণ্ডুষ জল দাও।”

পিসীমা আক্ষেপসহকারে বলিতেন, “যার এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নাই, সে বিয়ে ক’রে কি ক’রবে?”

বেগী লোকের কাছে বলিত, “পিসীমা বেঁচে থাকতে আঁদ্রিওঁ কচ্চি না।”

তা বেগীর নিজের অনিচ্ছাতেই হউক, বা পিসীমার চেষ্টার অভাবেই হউক, বেগী এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত হইয়াই রহিয়াছে। এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকার জন্ত বন্ধুবর্গের মধ্যে পরিহাসের সূচনা দেখিলে বেগী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া প্রতিগ্ন করিত,—বিবাহিত জীবন অপেক্ষা অবিবাহিত জীবন অতিশয় সুখময়, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে জীবনটা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইয়া পড়ে। এরূপ পরাধীন জীবনদ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। তা ছাড়া দেশ দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে দেশের অধিকাংশ যুবকেরই চিরকৌমাৰ্য্য ত্রুত অবলম্বন করা কর্তব্য। নতুবা অবিরাম বংশবৃদ্ধি দ্বারা দেশের দারিদ্র্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া দেশের, জাতির ও সমাজের সর্বনাশ সাধন করিবে।

এই যুক্তিগত বক্তৃতা শ্রবণে কেহ কেহ বেগী মাষ্টারের দূরদর্শিতার

আমীর বর

প্রশংসা করিত, কেহ বা এটাকে তাহার অক্ষমতা গোপন করিবার একটি
বাজে কৈফিয়ৎ মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিত। আর বেগী বিবাহে
বীতশ্রুততা দেখাইয়া, আহারান্তে ছিপ হাতে পুকুরধারে বসিয়া জনার্থিনী
যুবতীদিগকে বিলাসবিস্রম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিত।

নবম পরিচ্ছেদ

বেলা শেষ হইয়া আসিল তথাপি 'চারে' মৎস্যকুলের উপস্থিতির
ভাঙন লক্ষণ না দেখিয়া বাঁশী বিরক্তভাবে ছিপ তুলিয়া লইয়া বলিল,
“আজ আর কিছু হবে না মাষ্টার, এখানে বসে থাকার চাইতে চল, বদন
সর্দারের আখড়ার যাই। তবু ছ'হাত লাঠী খেলা শেখা যাবে।”

অপর পারের ঘাটে দুই তিনটা স্ত্রীলোক গামছার স্বাক্ষর মুখ ও মস্তক
উত্তমরূপে ঢাকিয়া, পিছন ফিরিয়া কাপড় কাঁচিতেছিল। “বন্ধ দৃষ্টিটা
সেইদিকে নিবন্ধ করিয়া বেগী উত্তর করিল, “তোমার খেলার ঝোঁক
এখনো যায়নি দেখছি।”

মাথা নাড়িয়া জোর গলায় বাঁশী বলিল, “বাঃ, লাঠীখেলার ঝোঁক
এরি মধ্যে যাবে কি? যখন আরম্ভ করেছি, তখন এটাকে ভালরকম
না শিখে ছাড়ছি না।”

বেগী জিজ্ঞাসা করিল, “কতটা শিখলে?”

বাঁশী বলিল, “শিখেছি বৈ কি, ছ'তিনটে প্যাচ ঠিক ক'রে নিয়েছি।
সেদিন চারের হাতটা সর্দার দেখিয়ে দিলে। অনেকটা হয়েছে; তবে
এখনো বাঁগড় দিয়ে প্যাচটা ঠিক সামলে নিতে পারি না।”

স্বামীর ঘর

বেণী তখন গাত্রমার্জননিরতা যুবতীদিগের হস্তচালন-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিতে করিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

“মাইরি ননদী আমি কালার পানে চাই না।”

ইঠাং গান থামাইয়া উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বেণী বলিল, “আমার কিন্তু ওসব ভাল লাগে না! দিনকতক ঝোঁকটা হয়েছিল বটে, কিন্তু ছোটলোকের ঘরে গিয়ে তার খোসামোদ—ও কাজ আমার ঘরায় হবে না।”

বাণী বলিল, “তা ছোটলোক হ’লে কি হয়, ওস্তাদ বটে তো। শিখতে হ’লে ওস্তাদের খোসামোদ না করলে হয়না, তা সে ছোটলোকই হোক আর ভদ্রলোকই হোক।”

মুখ সিটকাইয়া বেণী বলিল, “খোসামোদ কত্তে পারি, যদি শিখানো মত শিক্ষা হয়। লাঠীবাজী—একি ভদ্রলোকের কাজ?”

বাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তোমার লীলা বোঝা দায় মাষ্টার। তুমিই তো বলেছিলে, লাগীখেলাটা শেখা খুব দরকার। আজ আবার বলছো, ওটা ভদ্রলোকের কাজ নয়। বলতে কি মাষ্টার, তোমার মতের একটুও স্থিরতা নাই।”

স্ত্রীলোকেরা তখন জল লইয়া উঠিয়া বাইতেছিল। বাণীর কথায় উত্তর না দিয়া, তাহাদের গমনপথের উপর লক্ষ্য করিয়া বেণী গান ধরিল,—

“যমুনার জল আনুতে গেলাম,
কালাচাঁদের দেখা পেলাম,
কাঁথের কলসী রইল কাঁথে,
আমায় খুঁজে পাই না।
কালার পানে চাই না।

আমীর ঘর

গান ছাড়িয়া ছিণ গুটাইতে গুটাইতে বেগী ডাকিল, “আচ্ছা
বংশীবদন ?”

“কেন মাষ্টার ?”

“বৌটা তোমার কেমন হয়েছে ?”

“ঠিক বৌয়ের মত ।”

“তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কয় ?”

“দরকার হ’লে কয় বৈকি ।”

“তোমাকে ভালবাসে ?”

“অন্তর্যামী হ’লে বলতে পারতাম ।”

“তুমি ভালবাস ?”

“খু-উ-ব ।”

“তোমার দিদির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয় ?”

“হয়নি এখনো ।”

“পরে হ’তে পারে বোধ হয় ?”

“তা হ’তেও পারে ।”

“তখন তুমি কি করবে বংশীবদন ?”

ঈষৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, “ব’সে ব’সে হাসবো ।”

বেগী জিজ্ঞাসা করিল, “বৌকে কিছু বলবে না ?”

বাঁশী বলিল, “দিদিকে বেশ ক’রে দশকথা শুনিয়ে দিতে
বলবো ।”

“দিদিও যদি বিশ কথা শুনিয়ে দেয় ?”

“লাঠী ধরবো । আগে থাকতে লাঠী তুলে রেখেছি ।”

বাঁশীর পিঠে একটা আদরের চাপড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে বেগী

আমীর ঘর

বলিল, “জীতা রও বংশীবদন ! তোমার বোয়ের হাতের রান্না একদিন খাইয়ে দিও।”

“বৌ রাঁধতে শিখুক আগে।”

বলিয়া বাঁশী ছিপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বেণীও তাহার পশ্চাৎ পুকুরের পাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ঘরের খবর রাখ কি বংশীবদন ?”

ঘাড় নাড়িয়া বাঁশী বলিল, “হঁ, সব খবরই রাখি।”

বেণী। কিছু আমি বলছি, সব খবর রাখ না।

বাঁশী। কোন্ খবরটা রাখি না শুনি ?

বেণী। তোমার দিদির সঙ্গে বোয়ের ঝগড়াটা।

বাঁশী। দিদির সঙ্গে বোয়ের মোটেই ঝগড়া হয় না।

বেণী একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, “এত ঝগড়া হয় যে, রাগে দিদির এক একদিন খাওয়া পর্য্যন্ত হয় না।”

চমকিতভাবে খমকিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “কে বললে ?”

বেণী বলিল, “ওসব মেয়েলি কথা, মেয়েমানুষের কাছে থেকেই শোনা যায়।”

রূক্ষকণ্ঠে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কার কাছে শুনলে বল।”

বেণী বলিল, “আমি পিসীমার কাছে শুনেছি।”

বাঁশী। সত্যি ?

বেণী। সত্য মিথ্যা পিসীমাকে জিজ্ঞাসা কত্তে পার। কাল না কি তোমার দিদির দিন-রাত উপবাসে গিয়েছে ?

বাঁশীর চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, “আচ্ছা, চল তোমার পিসীমার কাছে।”

স্বামীর ঘর

“একুণি ?”

“হ্যাঁ একুণি ।”

“আমি কিন্তু এখন একবার গয়লা-পাড়ার দিকে যাব মনে কচ্ছি ।”

“সেখানে এর পর যেও ।”

বেণীর হাতটা চাপিয়া বাঁশী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল । যাইতে যাইতে বেণী তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, একটা পরের মেয়ে ঘরে আসিয়াছে, তখন এরূপ ঝগড়াঝাটি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক, সুতরাং ইহাতে বাঁশীর অধীর হইলে চলিবে না, তাহাকে এখন এই সকল অশান্তি সহ্য করিয়া যাইতে হইবে । এই অশান্তির ভয়ে বেণী এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই—ইহাতে লোকে যাহা হয় বলুক, কিন্তু বেণী এই অশান্তি অপেক্ষা আইবুড়ো অপবাদ শতগুণে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে ।

বাঁশী কিন্তু বেণীর এই সকল প্রবোধ বাক্যের উত্তরে হাঁ না কিছুই বলিল না, সে বেণীর হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে বেণীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল ।

দশম পরিচ্ছেদ

“হাঁ দিদি ।”

“কেন রে বাঁশী ?”

“কা’ল সারা দিন রাত খাওনি কেন ?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “কবে খাইনি ? কাল ? হাঁ, খাইনি, কা’ল দেহটা ভাল ছিল না ।”

আমীর খর

একটু প্লেবের হাসি হাসিয়া বাঁশী বলিল, “দেহ ভাল ছিল না, না মন ভাল ছিল না দিদি ?”

ঈশ্বর হাশাসহকারে পার্শ্বতী বলিল, “মন ভাল থাক্বে না কেন রে ? আর মন ভাল না থাক্লে লোকে কি উপোস দেয় ?”

বাঁশী বলিল, “তা দেয় বৈ কি । এই যে সেদিন রাগ হয়েছিল ব’লে সারাদিনটা আমি না খেয়ে ছিলাম ।”

পার্শ্বতী বলিল, “তোমার কথা ছেড়ে দে ! তোমার মত সস্তার রাগ আমার নাই ।”

বাঁশী বলিল, “সস্তার রাগ না থাক্, আক্রমণের রাগও তো থাক্তে পারে ।”

যেন খুব আশ্চর্য্যাস্থিতভাবে পার্শ্বতী বলিল, “তুই বলিস্ কি রে বাঁশী, রাগ ক’রে আমি উপোস দেব ? কার ওপর রাগ করবো আমি ?” —

বাঁশী বলিল, “যার সঙ্গে ঝগড়া করেছ, তার ওপর ।”

পার্শ্ব । আমি আবার কার সঙ্গে ঝগড়া ক’রে গিয়েছি বল্ তো ?

বাঁশী । অপর কারো সঙ্গে নয়, বৌয়ের সঙ্গে ।

পার্শ্ব । তুই আমাকে অবাক্ করলি বাঁশী, আমি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক’রে গিয়েছি !

বাঁশী । তুমি ঝগড়া ক’রে না যাও, বৌ তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক’রে পারে ।

তর্জ্জনসহকারে পার্শ্বতী বলিল, “হাঁ, পারে ! কে তোকে এ সব কথা বল্লে বল্ তো ?”

তাঁহার তর্জ্জনে একটুও ভীত না হইয়া বাঁশী সহাস্রমুখে বলিল, “যার কাছে তুমি ব’লেছ !”

স্বামীর স্বর

পার্কীতী যেন আকাশ হইতে পড়িল; ডান হাতটা গানের উপর রাখিয়া বিশ্বয়পূর্ণ স্বরে বলিল, “তোমার কথা শুনে আমি হাসবো না কঁাদবো বাঁশী? আমি বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক’রেছি, আর সেই কথা পাড়ায় পাড়ায় ব’লে বেড়িয়েছি! আমি কি পাগল!”

গম্ভীরভাবে মাথাটা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, “আমি তো জানুতাম, আমার দিদি পাগল নয়, কিন্তু আজকাল যে রকম শুন্ছি, তাতে তোমার মাথার ঠিক আছে ব’লে তো মনে হয় না।”

রাগতভাবে পার্কীতী বলিল, “কার কাছে তুমি এত কথা শুনেছিন্ বল্ তো?”

বাঁশী বলিল, “যার কাছেই শুনি না, মোদা ঝগড়াটা যে হ’য়েছিল, এটা ঠিক কি না?”

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া পার্কীতী বলিল, “হ্যাঁ, হ’য়েছিল। যদি হ’য়েই থাকে, তাতে তোমার কি বল্ তো?”

অবিচলিতস্বরে বাঁশী বলিল, “আমার কিছুই নয়, তোমারি শুকনো উপোস।”

ক্রোধগম্ভীরমুখে পার্কীতী বলিল, “বোয়ে গেছে আমার উপোস দিতে। কি ছুঁখে আমি উপোস দিতে যাব?”

সহাস্ত্রে বাঁশী বলিল, “বৌ হ’য়ে পাঁচ কথা শুনিয়া দিয়েছিল এই ছুঁখে।”

পার্কীতী বলিল, “হ্যাঁ, বৌ আমাকে পাঁচ কথা শোনাবে! আচ্ছা, ডাক্ দেখি বোকে।”

ঈহৎ হাসিয়া বাঁশী বলিল, “কে ডাক্বে? আমি?”

আমীর ঘর

অপ্রতিভভাবে পার্ৱতী বলিল, “আচ্ছা, আনিই ডাকছি। বো, ওগো বো।”

ঘরের ভিতর হইতে মৃদুভাবে উত্তর আসিল, “কেন ঠাকুরঝি?”

“একবার এখানে আস তো।”

ঘোমটার মুখ ঢাকিয়া লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আসিয়া পার্ৱতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পার্ৱতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ বো, কাল তোরা সঙ্গে আমার ঝগড়া হ’য়েছিল?”

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পার্ৱতী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চোখ টিপিল। তাহার অর্থ এই যে, ঝগড়া হইয়া থাকিলেও সে কথাটা প্রকাশ করা পার্ৱতীর উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাহার এই ইঙ্গিতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী নিম্নশব্দে বলিল, ঝগড়া হয় নি, তবে—”

পার্ৱতী তাড়াতাড়ি বলিল, “তবে কি হ’য়েছিল, সত্যি বল না।”

সঙ্গে সঙ্গে পার্ৱতী পুনরায় চোখ টিপিয়া সঙ্কেত করিল। লক্ষ্মী কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে সে সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে না পারিয়াই হউক, অথবা সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়াই হউক, ধীরে ধীরে উত্তর করিল, “হ’চার কথায় বচসা হ’য়েছিল।”

পার্ৱতীর মুখখানা অপ্রসন্ন হইল। কিন্তু মুহূর্তে সে ভাবটুকু দূর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া বাঁশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “শুনলি তো বাঁশী?”

হাসিতে হাসিতে বাঁশী বলিল, “হাঁ, শুনেছি বৈ কি, ঝগড়া হয় নি, তবে তুমি চোখ টিপে বারণ করলেও বচসা হ’য়েছিল।”

ঘাড় নাড়িয়া পার্ৱতী বলিল, “তা ঘর কত্রে গেলে অমন হ’য়েই থাকে।”

স্বামীর স্বর

বাঁশী বলিল “তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে স্বরটা ক্রমে না চড়ে ওঠে।”

গম্ভীরভাবে পার্শ্বতী বলিল, “না না, সে ভয় নাই তোমার। বৌ তেমন মেয়েই নয়। তবে ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নাই।”

ভারীমুখে বাঁশী বলিল, “কিন্তু পাড়ার পাঁচজননের জ্ঞানবুদ্ধি আরও কম দিদি; তারা তিলকে তাল ক’রে তোলে।”

ছিপগাছটা তুলিয়া রাখিয়া বাঁশী হাত পা ধুইতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “হা বৌ, তোমার রকম কি?”

মাথার কাপড়টা একটু সরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমার আবার কি রকম-সকম দেখলে ঠাকুরবি?”

ক্রুদ্ধভাবে পার্শ্বতী বলিল, “তোকে না ঝগড়ার কথা বলতে চোখ টিপে বারণ করলুম!”

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “তা বাপু আমি এত চোখ-টেপা মুখ-টেপা বুঝতে পারি না। আর সত্যি কথা বলবো, আর এত চোখ টেপাটিপিই বা কেন।”

তাহার এই তীব্র উত্তরে পার্শ্বতী যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রোষগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, “কেন তা তুই কি বুঝবি। বাঁশীকে তুই চিনিস না!”

“চিনি আমি সকলকেই!” বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া লক্ষ্মী জোরে জোরে গা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। পার্শ্বতী নিতান্ত হতবুদ্ধির মত স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সর্বনাশ! বৌ বলে কি? ঐ একরকমি মেয়ে, উহার মুখ দিয়া যে এত বড় কথা বাহির হইতে পারে ইহা পার্শ্বতীর কল্পনারও অতীত। এই কল্পনাভীত উত্তরে রাগে

স্বামীর ঘর

পার্কতীর গা কস্ কস্ করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই উত্তর-
গুলো একবার বাঁশীকে শুনাইয়া দেয়। কিন্তু ছি ! এতই কি ছোট মন
তাহার যে ঐ একরক্মি মেয়ের কথায় উত্তেজিত হইয়া বাঁশীর দ্বারা উহাকে
শাসন করিবে ? লোকে শুনিবে কি বলিবে ? বাঁশীই বা কি মনে করিবে ?
ছি, ঐ ছেলেমানুষের কথায় রাগ ! পার্কতী কি উহার অপেক্ষা ছেলে-
মানুষ ! কাল ঐ মেয়েটার কথায় রাগ করিয়া, দিনরাতটা অনাহারে
কাটাইয়া পার্কতী যে অগ্নায় কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও লজ্জিত
হইয়া পড়িল। ছি ছি, বাঁশী আবার সেই কথাটা কোথা হইতে শুনিয়া
আসিয়াছে। কোথা হইতে শুনিল ? পার্কতী তো কাহারও কাছে
বলে নাই ? তবে কি বোঁ—না না, ও কাহাকে বলিতে যাইবে ?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে পার্কতী ডাকিল, “বোঁ !”

“কেন ঠাকুরঝি ?”

আ-মরণ, আবার সেই কথা তুলিতে যাইতেছে। এখনই হয় তো
বাঁশী আসিয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া পার্কতী বলিল,
“না, বলি কি কচ্চিস্ ? বাঁশীর তরে গোটা দুই পান সেজে রাখ্ না।”

লক্ষ্মী একটু তীব্রস্বরেই উত্তর দিল, সে আমি অনেকক্ষণ সেজে
রেখেছি, তোমাকে বলতে হবে না।”

এই উত্তরে পার্কতীর জ্বয়ুগল কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে
ভাবটাকে দমন করিয়া একটু হাসিয়াই বলিল, “তা বেশ করেছিস্। এই
রকম না বলতেই তো কাজ কত্বে হয়।”

বলিয়া পার্কতী তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাপ্রদীপ জালিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত
হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

“মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে”—এই প্রবাদটা পার্শ্বতীর অদৃষ্টে যে সত্য হইয়া পড়িবে ইহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। কেবল পার্শ্বতী কেন, কেহই কখন ইহা বুঝিয়া কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। পারিলে বোধ হয় মানুষকে নৈরাশ্রের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইত না।

মানুষের সুখাশ্বেষণ-প্রবৃত্তিটা বড়ই প্রবল। দুঃখের অঙ্কতম গর্ভে নিপতিত হইয়াও মানুষ সে প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিতে পারে না। গভীর দুঃখরাশির মধ্যেও একটু সুখকে হাতড়াইয়া বেড়ায়—কল্পনায় তাসের ঘর নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সুখাশ্বেষণ-প্রবৃত্তিকে পরিভ্রষ্ট করিতে চেষ্টিত হয়। কিন্তু বিধাতার এক ফুৎকারে সেই কল্পনারচিত তাসের ঘর যখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন গভীর নৈরাশ্রের অঙ্ককারে সে আর পথ খুঁজিয়া পায় না।

পার্শ্বতীর দশাও অনেকটা এইরকম হইয়া দাঁড়াইল। মেয়ে মানুষের প্রধান সুখ স্বামী—স্বামীর ঘর। সেই স্বামী ও স্বামীর ঘর দুই-ই যখন তাহার কাছে দুর্লভ হইয়া উঠিল, তখন এই প্রধান সুখে জলাঞ্জলি দিয়াও সে সুখাশ্বেষণে বিরত হইতে পারিল না, বাণীর বিবাহ দিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজ্ঞায়াকে লইয়া নিজের সুখের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টিত হইল। একটী লক্ষ্মী বৌ ঘরে আসিবে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া নিষ্ক্রিয় জীবনের মধ্যে কার্যের একটা ব্যস্ততা আনিয়া ফেলিবে, ভ্রাতৃজ্ঞায়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া গৃহিণীগনার সাধ পূর্ণ করিবে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজ্ঞায়ার আমোদ প্রমোদ দেখিয়া নিজের আমোদপ্রমোদবর্জিত

স্বামীর ঘর

জীবনটাকে চরিতার্থ করিয়া লইবে, নিজের সুখ হারাইয়া পরের সুখে স্থগী হইবে।

এইরূপ আশা করিয়াই পার্কস্‌তী বাণীর অনিচ্ছাসঙ্গেও তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার বিবাহ দিল। কিন্তু বিধাতা যে তাহার আশার সুধাসমুদ্রে নৈরাশ্যের তিক্ত হলাহল ঢালিয়া দিবেন, তাহা সে জানিত না। বোয়ের রূপ দেখিয়া তাহার আনন্দ ধরে না, কিন্তু প্রফুল্লকুসুম মধ্যে বিষাক্ত কীটের মত এই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে বিষম ফুটিত। বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিবে কেমন করিয়া? বৎসর না ঘুরিতেই সে বোকে ঘরে আনিয়া কল্লিত আশার সংসার পাতিয়া বসিল।

দিনকতক—যতদিন লক্ষ্মী স্বামীর ঘরকে পরের ঘর মনে করিয়া নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত অবস্থান করিতেছিল, ততদিন বেশ সুখেই পার্কস্‌তীর দিনগুলো অতিবাহিত হইল। এই সুখের মাত্রা যোল কলায় পূর্ণ হইত, বাণী যদি স্ত্রীর সহিত পার্কস্‌তীর ইচ্ছানুরূপ মেলামেশা করিত। কিন্তু বাণী তাহা করিল না। এজন্য পার্কস্‌তী তাহাকে তিরস্কার করিল, ধমক দিল তথাপি বাণী দিদির ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না, লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার বেশ মনের মিল হইল না। পার্কস্‌তীর সুখটা কিয়দংশ অপূর্ণ রহিয়া গেল।

এই অপূর্ণতার জন্য পার্কস্‌তী যেমন দুঃখিত হইল, তেমনি সেই দুঃখের সঙ্গে একটা অব্যক্ত আনন্দ আসিয়া তাহার এই দুঃখের বেদনাকে অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিল। আহা, বাণীর যে দিদি-অন্তপ্রাণ, দিদি ছাড়া জগতে সে যে আর কিছুই জানে না, কাহাকেও চায় না। দিদির সকাতির অহুরোধে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু

খামীর ঘর

দিদিকে ছাড়িয়া সে কি ঐ বোটার উপর নিজের মন সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত করিতে পারে? সে ছেলে বাঁশী নয়। কত ছেলে বোঁ পাইয়া মা বাপকে পর ভাবিয়া থাকে, কিন্তু দিদির জগ্ৰাই বাঁশী নিজের বোঁকেও আপন ভাবিতে পারিতেছে না! হাঁ, ভাই বটে! এক মাগের পেটের ভাইও বোনের উপর এতটা ভক্তিশ্রদ্ধা—অসামান্য ভালবাসা দেখাইতে পারে না।

বাঁশীর ভক্তি ও ভালবাসা স্বরণে পার্কতীর বুকটা আনন্দে বেশ ফুলিয়া উঠিত এবং তাহাতেই তাহার এই অপূর্ণ সুখটুকু যেন পূর্ণ হইয়া আসিত।

কিন্তু পার্কতীর এই সুখের ভরা-গাঙ্গে সেইদিন ভাটা আরম্ভ হইল, যেদিন লক্ষ্মী সন্ধ্যাচ ত্যাগ করিয়া পার্কতীর মুখে-মুখে সমান উত্তর করিল। সে উত্তরটাকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিলেও সেইদিন হইতেই পার্কতী যেন একটু দমিয়া গেল। সেইদিন হইতে সে লক্ষ্মীকে যেন একটু ভীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। জানি না, এই বোঁ তাহার বহুদূর বর্দ্ধিত আশা-লতাটিকে উৎপাটিত করিয়া দিবে কি না। কিন্তু এই আশঙ্কাকে পার্কতী নিশ্চিত সত্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারিল না, দিতে যেন কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

আশঙ্কা কিন্তু ক্রমেই সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম করিল। পার্কতী দেখিল, লক্ষ্মী আর সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিতা ভীতিবিনম্রা নববধূ নহে, অল্প দিনের মধ্যে সে অল্পে অল্পে গৃহিণীর পদ অধিকার করিবায় জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সে এখন আর পার্কতীর আদেশ বিনা প্রভিবাদে পালন করিতে চায় না, বরং পার্কতীর উপরেই হুসুম চালাইতে যায়। পার্কতীর কাজের ক্রটি ধরিয়া আপনাকে পাকা

আমীর ঘর

গৃহিণী প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হয়। সংসারের লাভ লোকসান খতাইয়া অপচয় নিবারণ করিবার জন্ত পার্কর্তীকে উপদেশ দিতে যায়। সে উপদেশ শুনিয়া পার্কর্তী কখন হাসে, কখন রাগে গম্ভীর হইয়া থাকে।

একদিন কিন্তু পার্কর্তী আর গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন মধ্যাহ্নকালে বেন্দার মা আসিয়া পার্কর্তীকে জানাইল যে, আজ তাহাঙ্কের ঘরে চাউল নাই, সের দুই চাউল না দিলে তাহাদের আজ উপবাস দিতে হইবে। বেন্দা পার্কর্তীর নিতান্ত অল্পগত ছিল, সে প্রাণ দিয়াও পার্কর্তীব কার্য সাধনের চেষ্টা করিত, পার্কর্তীও সময়ে সময়ে আপদ বিপদে সাহায্য করিয়া যাইত। সুতরাং বেন্দার মার প্রার্থনার পার্কর্তী তৎক্ষণাৎ দুই সের চাউল আনিয়া তাহার কাপড়ে ঢালিয়া দিল।

বেন্দার মা চাউল লইয়া চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসিয়া পার্কর্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ও মাগীকে চাল দিলে কেন, ঠাকুরঝি?”

পার্কর্তী বলিল, “ওদের ঘরে আজ চাল নাই, তাই দিলুম।”

লক্ষ্মী বলিল, “চাল নাই যদি, কিনে আনলেই তো পারতো।”

পার্কর্তী বলিল, “পয়সা থাকলে তো কিনে আনবে।”

ভারী মুখে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “তাই বুঝি আমাদের কাছে ধার চাইতে এসেছিল?”

মুখ মচকাইয়া পার্কর্তী বলিল, “ধার-ধোর নয় উপোস যাবে, তাই দিলুম।”

একটু শুষ্ক খাইয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, “তাহ’লে খয়রাৎ করুলে বল।”

পার্কর্তী বলিল, “হাঁ, খয়রাৎ নয় তো ওদের কাছ থেকে দু’সের চাল আবার ফিরিয়ে নেব কি?”

স্বামীর স্বপ্ন

জুড়ুখিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “হুঁসের চালের দাম কত, ঠা হুঁসি ?”
পার্কী একটু হাসিল, বলিল, “কেন, চালের ব্যবসা করবি
নাকি ?”

লক্ষ্মীর মুখে লক্ষ্মী বলিল, “না, তাই জিজ্ঞেস করছি।”

পার্কী বলিল, “কে জানে কত দর। বোধ হয় তিন চার আনা
হবে।”

যেন একটু কর্তৃত্বের স্বরে লক্ষ্মী বলিল, “এই তিন চার আনা পয়সার
চাল নাহক বিলিয়ে দিলে।”

তাহার এই কর্তৃত্বচক প্রসঙ্গে পার্কী এবার না রাগিয়া থাকিতে
পারিল না। ঈর্ষ্য রাগতভাবে বলিল, “ই বিলিয়ে দিয়েছি, তোর এত
খোঁজে দরকার কি বল তো ?”

তাহার রাগে লক্ষ্মী কিছু একটুও দমিল না ; সে বেশ স্পষ্ট স্বরেই
উত্তর করিল, “সংসারে থাকতে হ’লে এমন খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।”

রাগে জুড়ুটা করিয়া পার্কী বলিল, “না, তোমার অত খোঁজ থবর
নিতে হবে না। আমি বিলিয়ে দিই, ফেলে দিই, সে আমি বুঝবো।
বিলিয়ে দিয়েছি ব’লে তোর খাওয়ার তো কম পড়বে না।”

মুখখানিকে জুড়ুখিত করিয়া—বিরাগের স্বরে লক্ষ্মী বলিল, “কারো
খাওয়াতেই কম পড়বে না। কম পড়বার ভয় থাকলে কি কেউ বিলিয়ে
দিতে পারে ?”

বলিয়াই লক্ষ্মী পার্কীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ
করিয়া ক্ষতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। পার্কী মাছ ভাজিয়া উনান
হইতে কড়াটা নামাইতেছিল, সেটা তাহার হাত হইতে ছুঁইয়া
পড়িয়া গেল, কড়ার মাছগুলো মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। পার্কী

স্বামীর স্বপ্ন

সেগুলোকে তুলিল না। তুলিবার শক্তি যেন তাহার ছিল না। সে ভূপতিত মাছগুলোর দিকে চাহিয়া শুষ্ক নিম্পন্দ ভাবে বসিয়া ~~ছিল~~।

রন্ধন শেষ করিয়া পার্কসী বাঁশীকে ধাওয়াইল, লক্ষ্মীকে ভাত দিল, কিন্তু নিজেকে খাইল না; হাড়ী তুলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। লক্ষ্মী আহাঙ্গাদি শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “শুয়ে পড়লে যে ঠাকুর কি, ভাত খাবে না?”

পার্কসী মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, “না।”

“কেন, কি হ’য়েছে যে ভাত খাবে না!”

বিরক্তির সহিত পার্কসী উত্তর করিল, “মাথা ধরেছে।”

মুখ ভারী করিয়া কিছুকণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া লক্ষ্মী একটু ভীতস্বরেই বলিল, “সত্যি কথা বলনা কেন ঠাকুরঝি, মাথা ধরেছে না রাগ হ’য়েছে।”

মাথা তুলিয়া গর্জন করিয়া পার্কসী বলিল, “হা রাগ হ’য়েছে, তুই তার কি করবি বলতো?”

তাহার রাগ দেখিয়া লক্ষ্মী একটু ভীত হইল এবং আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া আসিল।

সারাদিনটা অনাহারে কাটিয়া গেল। রাত্রিতে লক্ষ্মী বলিল, “আচ্ছা ঠাকুরঝি, আমার ওপর রাগ ক’রে, উপোষ দিয়ে তোমার কি লাভ হলো?”

পার্কসী বলিল, “আমার লাভ নাই হোক, তোদের লাভ আছে।”

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদেরি বা লাভটা কি?”

স্বামীর খর

শ্বেতভীষকর্থে পার্কীতী বলিল, “হুঁসেরের মধ্যে তবু সের-খানেক চালও তো তোদের বেঁচে যাবে।”

এ কথায় লক্ষ্মী যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ভাত খাইবার জন্ত পার্কীতীকে অনুরোধ করিল। পার্কীতী কিন্তু খাইল না, শুধু এক ঘটা জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া সে অনেক ভাবিল, অনেক ভাবিল, অনেক গড়িল। স্বথের আশায় সাধ করিয়া যে সংসার পাতিয়াছে, সেই সংসার পরিণামে তাহার কাছে যে কিরূপ সুখাবহ হইবে তাহা যেন কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হায়, তাহার যে একুল ওকুল দুই কুলই গিয়াছে! যে স্বখটা তাহার নিজস্ব, তাহা তো অনেকদিনই হারাইয়া ফেলিয়াছে, তারপর পরকে লইয়া সে যে স্বথের আশা করিয়াছিল, সে আশাও নিফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার উপর এই নিফলতার জন্ত কাহাকেও দোষী করিয়া মনটাকে যে একটু সান্ত্বনা দিবে সে উপায়ও নাই। দোষী সে নিজে। সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছে, নিজের হাতে পুকুর কাটিয়া সেই পুকুরে ডুবিয়া মরিতেছে, উদ্ধারের জন্ত যে কাহাকেও ডাকিবার যো নাই। ডাকিবেই বা কাহাকে? বাপী যদি শোনে তাহা হইলে তো রক্ষা রাখিবে না। আগে তো সে পার্কীতীর উপর পড়িবে, তারপর বোটার যে কি করিবে তাহা বলা যায় না। ছি, ছি, বাপীকে একথা শুনিতে দেওয়াই হইবে না। ভাগ্যে সে আজ সারা দিনটা বাহিরে বাহিরে রহিয়াছে! কিন্তু কোনরূপে যদি শুনিতে পায়, বোয়ের কথায় রাগ করিয়া পার্কীতী সারা দিনরাত উপবাসে কাটাইয়াছে, তাহা হইলে সে কি অনর্থ করিয়া বসিবে বলা যায় না। ছি, ছি, না বুঝিয়া রাগের মাখায় পার্কীতী এ কি করিয়া বসিল?

শ্রমীর স্বপ্ন

এখন স্বপ্ন ছুঃখ সব চাপা দিয়া এই ব্যাগারটা বাহাতে বেশী দূরে না গড়ায় সর্ব্বাঙ্গে তাহাই করিতে হইবে ।

পরদিন সকালে উঠিয়া পার্শ্বভী লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “দেখ্ বৌ, আমি এদিক্কার কাজকৰ্ম্ম সেয়ে নিচ্ছি, তুই সকাল সকাল নেয়ে এসে ভাত একমুঠো চাপিয়ে দে।”

লক্ষ্মী শুনিয়া আশ্চর্য্যস্থিত হইল এবং কোন কথা না বলিয়াই স্নান করিতে গেল ।

এত সকালে স্নানের ঘাটে অপর কেহ ছিল না । শুধু বৌ মাষ্টারের পিসী স্নান করিতে নামিয়াছিলেন । তিনি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত সকালে নাইতে এসেছ যে বৌমা ?”

লক্ষ্মী উত্তর দিল, “নেয়ে গিয়ে সকাল সকাল রান্না চাপাতে হবে ।”

পিসী । এত সকাল রান্না কেন গা ? বাঁশী খেয়ে কোথাও যাবে নাকি ?

লক্ষ্মী । না, ঠাকুরঝির কাল থেকে খাওয়া হয়নি ।

পিসী । অস্বপ্ন বিস্বপ্ন করেছিল নাকি ?

লক্ষ্মী । না, রাগ হ’য়েছিল ।

পিসী । রাগ ? কার ওপর রাগ গা ?

লক্ষ্মী । আমার ওপর !

পিসী । তোমার ওপর রাগ কেন গা ? কিছু ঝগড়াঝাটী হয়েছিল বুঝি ?

লক্ষ্মী । ঝগড়া এমন কিছু হয়নি, তবে ঘর কঁপে গেলে যেমন ছ’ এক কথা হয় তাই হ’য়েছিল ।

পিসী ইহাতে যেন খুব বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিলেন, “ওমা, সে

স্বামীর ঘর

কি গো ? এই এত সাথ-সমাল করে ভায়ের বিয়ে দিলে, আর দু'মাস ভাজকে নিয়ে ঘর না কত্তেই তার সঙ্গে বগড়া, রাগ, গোসা ! তুমি রাগ করো না বৌমা, তোমার ননদটী—মেয়ে তেমন সোজা সরল নয় । তাহ'লে কি সোয়ামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না, না সে ছোঁড়া আবার বিয়ে করে ।”

লক্ষ্মী মুহূ হস্তদ্বারাই পিসীর মস্তব্যে নীরবে সায় দিয়া স্নান শেষ করিল এবং ঘরে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি রান্না চাপাইয়া দিল ।

খাইতে বসিয়া পার্কতী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ বৌ, বাঁশীকে কোন কথা বলেছি নাকি ?”

লক্ষ্মী বলিল, “না ।”

পার্কতী বলিল, “বেশ করেছি । খবরদার, একথার বিন্দু বিসর্গ বাঁশী যেন জানতে না পারে ।”

লক্ষ্মী বলিল, “আচ্ছা ।”

কিন্তু পার্কতীর সতর্কতাসত্ত্বেও বাঁশী যখন অসম্ভাবিতরূপে কথাটা শুনিয়া ফেলিল, তখন পার্কতীর লজ্জার সীমা রহিল না । তবে সুখের বিষয়—কথাটা লইয়া বাঁশী তেমন নাড়াচাড়া করিল না । পার্কতী ইহাতে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

“হাঁরে বাঁশী ।”

“কেন গা দিদি ?”

“কাল রাত্রে বৌকে কি ব’লেছিলাম ?”

ঈশ্বর হাসিয়া বাঁশী বলিল, “কি ব’লেছি তাতো তুমি শুনেছ দিদি । বৌ যখন তোমার কাছে নালিশ করেছে, তখন আমার অপরাধটাও তোমাকে শুনিয়ে দিয়েছে নিশ্চয় ।”

পার্কী একটু রাগতভাবে বলিল, “তা আমার কাছে নালিশ করবে না তো বেস্কার মায়ের কাছে নালিশ ক’রে যাবে ?”

সহাস্তে বাঁশী বলিল, “বুদ্ধিমান হ’লে তাই কর্তো ! যার জন্তে বকুনি খেয়েছে, তার কাছে নালিশ করা একটুও বুদ্ধির কাজ হয়নি দিদি ।”

বাঁশী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল । পার্কী স্বরে কতকটা রাগের ভাব আনিয়া বলিল, “আমার জন্তে কেন ওকে বকাবকি করবি বল তো ? ও আমার কি ক’রেছে ?”

বাঁশী বলিল, “এমন কিছু করেনি, শুধু আমাকে খাটো ক’রে নিজের গিন্নিপণা জাহির ক’রে গিয়েছে ।”

ঘাড় মুখ নাড়িয়া পার্কী বলিল, “সে আমি বুঝবো, তুই আমার উপর কর্তৃত্ব দেখিয়ে ওকে ব’লে গিয়েছিস কেন বল তো ?”

একটু অপ্রতিভভাবে বাঁশী বলিল, “আমার ঝগুমারি হ’য়েছে দিদি ।”

স্বামীর স্বপ্ন

পার্কটী বলিল, “দু’শোবার স্বপ্নকারি, হাজারবার স্বপ্নকারি। আমি তোকে ব’লে দিচ্ছি বাণী, তুই ওকে কিছু বলতে পারবি না।

বাণী। তোমাকে পাঁচকথা শুনিয়ে দিলেও না?

পার্কটী। না।

বাণী। তোমাকে ধ’রে যদি দু’ধা মারে।

পার্কটী। মারে মারবে। কিন্তু আমার ওপর দরদ দেখিয়ে তুই যে বোকে কিছু বলবি, সে আমার সহ্য হবে না।

বাণী দেখিল, অদূরে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী মুখ টিপিয়া উপহাসের হাসি হাসিতেছে। বাণী রাগে অকুটী করিয়া বলিল, “আচ্ছা দিদি, তাই হবে। ও তোমাকে ধরে ঝাঁটা মারলেও আমি যদি কিছু বলি তবে আমাকে তোমারি দিব্যি।”

বাণী রাগে জ্বরে জ্বরে পা কেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “কিসের দিব্যি হে বাণীবদন, হ’য়েছে কি? এত রেগে উঠেছ কেন?”

বাণী থমকিয়া দাঁড়াইল। বেণী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’য়েছে? দিদির সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে নাকি?”

বাণী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “না না, ঝগড়া নয়, তবে কি জ্ঞান, দিদির হচ্ছে সবটাই অশ্রদ্ধা কথা।”

বেণী হাসিয়া উঠিল, বলিল, “তা দিদির এখন অশ্রদ্ধা কথা হবে

আমীর খর

বৈ কি হে, এখন বৌ ছাড়া আর কেউ কি জায় কথা বলতে পারে ?”

ভ্রম্ভী করিয়া বাঁশী বলিল, “আরে রেখে দাও তোমার বৌ ! ঐ বৌ নিয়েই তো আগুন জ্বলেছে ।”

সহাস্ত্রে বেণী বলিল, “বল কি, তিন দিন বৌ নিয়ে ঘর না কন্তেই আগুন জ্বলে উঠলো ? কে আগুন জ্বালালে শুনি, বৌ, না দিদি ?”

বলিয়া বেণী পার্শ্বতীর দিকে সহাস্ত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক ধীরে ধীরে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। পার্শ্বতী দেখিল, বড় বিপদ, বেণীর বেক্রপ আগ্রহ, তাহাতে সে ঘরের কথা সব না শুনিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু এ সকল কথা বেণীকে শুনাইবার জন্ত পার্শ্বতী আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। অথচ দাঁড়াইয়া থাকিলে বেণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে দুই একটা কথাও না বলিয়া চূপ করিয়া সে থাকিতে পারিবে না। কাজেই পার্শ্বতী বাস্তব হইতে একখানা থালা বাহির করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলেও বেণীর শুনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না, সে প্রব্লেট উপর প্রশ্ন করিয়া বাঁশীর নিকট হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সকল কথাই শুনিয়া লইল এবং শুনিয়া গম্ভীরভাবে বাঁশীকে উপদেশ দিয়া বলিল, “তা দিদি তো মন্দ কিছু বলেনি বংশীবদন ! পরের মেয়ে, গুর এখানে আপন বলতে আছে কে ? ও বেচারীর উপর এতটা নিষ্ঠুরতা দেখালে ও বাঁচবে কেন ?”

বিরক্তির সহিত বাঁশী বলিল, “তাই বলে অজায় দেখলেও শাসন কন্তে হবে না ?”

বেণী হাসিয়া বলিল, “শাসন কন্তে হবে বৈ কি, কিন্তু সে শাসনটা

আমীর ঘর

ঠিক গরু ছাগলকে শাসন করার পদ্ধতিতে নয়, তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র।”

রাগতভাবে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “স্বতন্ত্র পদ্ধতিটা কি শুনি?”

বেণী বলিল, “সে পদ্ধতি দিদির কাছে জেনে নিও, পারি তো আমিও এক সময়ে তোমাকে শিখিয়ে দেব।”

বিরক্তির সহিত মুখ বিকৃত করিয়া বাঁশী বলিল, “মরুক্কে সব। এখন যাত্রা শুনতে যাবে কি?”

বেণী বলিল, “বাঃ, যাত্রা শুনতে যাব না, সেইজন্মেই তো তোমাকে ডাকতে এসেছি।”

“তবে চল” বলিয়া বাঁশী আলনা হইতে ছিটের কোটটা টানিয়া লইল এবং সেটাকে কাঁধে ফেলিয়া চটি জুতাটা পায়ে দিয়া বেণীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

পার্কভী ঘাট হইতে ফিরিয়া, বেণী চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ব্রহ্মোদ্দেশ্য পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর পার্কভী লক্ষ্মীকে সন্ধান করিয়া বলিল, “হাঁ বোঁ, মাথাটাকে এমন কাটনার চুবড়ী করে রেখেছিস কেন?”

মুখ মুচ্কাইয়া লক্ষ্মী উত্তর করিল, “হ’য়ে গেছে।”

পার্কভী বলিল, “হয়ে গেছে কেন? চুলটা তো বাঁধলেই হয়।”

ঈষৎ বিরক্তির সহিত লক্ষ্মী উত্তর করিল, “কখন বাঁধি বল?”

আমীর ঘর

তাহার কথায় যেন একটু বিষয় অসম্ভব করিয়া পার্শ্বতী বলিল,
“বলিস্ কি বোঁ, সংসারের এত কাজ যে চুলটা বাঁধতে সময় পাস্ না ?”

“সময় পেলে কি এমন হ’য়ে থাকে ?” বলিয়া লক্ষ্মী মুখটা ঘুরাইয়া
নইল। পার্শ্বতী বিষয়পূর্ণদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার বিরাগকুঞ্চিত মুখের
দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “ধন্তি তোরা কাজ ! আর
ধন্তি তোরা সময় না থাকা ! আচ্ছা, তোরা সময় না থাকে আমার এখন
সময় আছে। আর, আমিই না হয় চুলটা বেঁধে দিই। আমার চুল বাঁধা
যে তোরা পছন্দ হয় না।”

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “পছন্দমত বেঁধে দিলেই পছন্দ
হয়।”

এই তাম্বুলানুচক উক্তিতে পার্শ্বতীর রাগ হইল। কিন্তু সে
বাগটাকে চাপিয়া একটু শুক হাসি হাসিয়া বলিল, “তা কি করবো বল,
তোরা যে ইংরেজ-পছন্দ চুল বাঁধা। আমি তেমন না জানলে তো দিতে
পারবো না।”

তীব্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, “পাববে না তো, কে তোমাকে দিতে হবেই
ব’লে পরাকাষ্ঠা দিচ্ছে বল।”

অবজ্ঞায় মুখখানাকে বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী ক্রতপদবিক্ষেপে ঘরের
ভিতর চলিয়া গেল। পার্শ্বতী বিবাদগম্ভীরমুখে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া
বসিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া
পড়িল।

ইহার অন্তরক্ষণ পরেই লক্ষ্মী চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম লইয়া, আরসিখানা
সম্মুখে রাখিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে সে এক একবার
সম্মুখবর্তী আরসিখানার দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে থাকিল।

- স্বামীর ঘর

আরসির ভিতর হইতে ঐ যে মুখখানা—ওটা কাহার মুখ ? তাহার নিজের মুখ কি ? তাহার অপাঙ্গে কি এমনই বিদ্যুতের চাঞ্চল্য আছে ? ঝকুঝনে মুখমণ্ডলের লালিত্য এমনই বিকসিত হইয়া উঠে ? গ্রীবাভঙ্গীতে বায়ুভরে দোহুলায়মান পদ্মটির মত তাহার মুখখানা এমনই অনৌকিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে পারে ? হাসিতে—রক্তিম অধরে এই মতই কি বিজলীর বিকাশ হয় ! তাহার ঝকুঝন-শোভিত মৃদু হাস্যচ্ছটাবঞ্জিত গ্রীবাভঙ্গাভিরাম মুখমণ্ডলের স্থির সৌন্দর্য্য দর্শনে কেহ কি সেই মুখের দিকে এমনই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে ? কৈ, কেহই তো থাকে না ? এমন সৌন্দর্য্যভরা ফুটন্তফুলের মত ঢলঢলে মুখখানা দেখিয়া কেহই ত মুগ্ধ হয় না ? হইলে তাহাকে কি এইরূপে অনাদৃত—লাঞ্ছিত হইতে হয় ! তবে তাহার এ সুন্দর মুখের মূল্য কি ? যে ইহার মূল্য বুঝিবে, সে তো ইহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না ! সে শুধু ছিপ, লাঠি আর গান লইয়াই ব্যস্ত । বাকি সময়টুকু দিদির ভাবনাতেই অস্থির । দূর হউক, এ পোড়া মুখের দিকে আর চাহিব না ।

ঝকুটা সহকারে আরসির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া লক্ষ্মী চুলের গোছার উপর ঘন ঘন চিকুণী চালাইতে লাগিল ।

এমন সময় পার্কর্তীকে ডাকিতে ডাকিতে বামুনদিদি বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কেশপ্রসাধনে ব্যাপৃত লক্ষ্মীকে দেখিয়া সহাস্রমুখে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কছো বোঁ ? পার্কর্তী কোথায় ?”

লক্ষ্মী গাভ্রবস্ত্র কতকটা সংযত করিয়া লইতে লইতে মৃদু উপেক্ষার স্বরে উত্তর করিল, “ঘুমুচে বুঝি ।”

বামুনদিদি যেন কতকটা বিশ্বয় ও কতকটা সহানুভূতির স্বরে

স্বামীর স্বর

বলিলেন, “ওমা, সে ঘুমুচ্ছে, আর তুমি নিজে ব’সে চুল বাঁখচো ? কেন, পার্কতী কি তোমার চুলটা বেঁধে দিতে পারে না ?”

লক্ষ্মী উঠিয়া বামুনদিদিকে বসিতে আসন দিল, এবং পুনরায় চুল বাঁধিতে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “না পারুলে কি করবো বলুন, জোর আছে কি ? ক’দিন থেকে চুলটা আলগা আছে, তাই বলি নিজেই যেমন পারি বেঁধে ফেলি।”

বামুনদিদি বিরক্তিতে মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “খন্টি ! এতই কাজের ভিড় যে, তোমার চুলটা বেঁধে দিতেও সাবকাশ হয় না। আব কাজও তো কত ! তার অর্ধেকের ওপর কাজ তো তুমিই কর। আমরাও তাই বলাবলি করি, বাঁশীদের বোঁএর চুল দিন দিন এমন হ’য়ে যাচ্ছে কেন ? চুল ত নয় যেন রাশগাছ ! যখন এসেছিলে, তখন চুল দেখে সকলে অবাক হ’য়ে গিয়েছিল। তেমন চুল, শুধু অবশ্যেই এমন খুঁটিসার হয়ে দাঁড়িয়েছে !”

চুলের রাশি হ্রাস না পাইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইলেও লক্ষ্মী কিন্তু ভাবিল তাহার চুল বাস্তবিকই কমিয়া গিয়াছে। রমণীর সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান কেশের অপচয়ে লক্ষ্মীর মুখখানা একটু মলিন হইয়া আসিল, এবং আরসির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরবে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বামুনদিদি তাহার স্নান মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হায়রে চুল ! আমার ছোট-জা যখন প্রথম আসে, তখন নেড়া বললেই হয় ; সকলে বললে, ওর চুল হবেনা। আমি বলি, আরে যত্ন করলে আবার চুল হবেনা ? সব কাজ ফেলে রোজ সকালে বিকালে চুল বেঁধে দিতে লাগলুম। একবছরের চুল হ’লো যেন রাশগাছ। যে দেখে সেই বলে, হাঁ বামুনঠাকুরণ, তুমি

আমীর ঘর

মস্তুর জান না কি ? আমি বলি, হাঁ, খুব ভাল মস্তুর জানি । তা ছোট বোঁ এখন সে কথা মানে না । সে নাই মাহুক, পাঁচজনে তো জানে ।”

লক্ষ্মী বিনানী করিতে করিতে বলিল, “তা বৈ কি, যত্ন করলে আর চুল হয়না ?”

সগর্বে ঘাড় দোলাইয়া বামুনদিদি বলিলেন, “খুব হয়, খুব হয় দিদি, তবে আপনার লোকের যত্ন চাই । কিছু মনে ক’রো না বোঁ, যতই হোক এ তো আর তোমার আপনার নন্দ নয় । আপনার হ’লে কি আর এমন কস্তে পারে ?”

হঠাৎ একটা নূতন কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বামুন দিদির মুখের দিকে চাহিল । মুখের ভাবেই তাহার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া বামুনদিদি ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে লক্ষ্মীর বিস্ময় অপনোদন করিয়া বলিলেন, “আ কপাল, তা বুঝি জান না ? ও কি বাঁশীর এক মায়ের পেটের বোন ? জাটুতুতো বোন ।— ও হ’লো বড়র মেয়ে, আর বাঁশী হ’লো ছোটর ছেলে ।”

ও হস্বি, গোড়াতেই এত গলদ ! যেন একটা বিষম ভ্রম দূরীভূত হওয়ায় লক্ষ্মী নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “জাটুতুতো নন্দ আমি তো তা জানি না ।”

বামুনদিদি বলিলেন, “তুমি আর জানবে কি করে ? খুব ছোট বেলায় ওর মা-বাপ দুই জনেই মারা যায়, খুড়ো খুড়ীই মাহুক ক’রে বিয়ে দেয় । বিয়ে দিয়েছিল খুব বড় গেরস্ত ঘরেই, কিন্তু সেখানে বনিবনাও হইলো না , ঝগড়া করে এখানে চ’লে এল । জামাই কতবার নিতে এলো, কিন্তু কিছুতেই গেল না । কাজেই সে আবার বিয়ে করেছে ।”

স্বামীর স্বপ্ন

ভিতরের রহস্যজনক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীর মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল, “তা’হলে তো খুব চমৎকার মেয়ে !”

ললিট কুণ্ঠিত করিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “কেমন মেয়ে, ভাল কি মন্দ, এত কথা কইতে চাই না ভাই, হাজার হোক তোমাদের আপনার লোক । তবে এদিনেও যে তুমি কিছু জান না এই আশ্চর্য্য ।”

লক্ষ্মী বলিল, “কেমন ক’রে জানবো বামুনদিদি, কেউ তো আমাকে বলে না ।”

বামুনদিদি বলিলেন, “বাঁশ্শিও কিছু বলেনা ?”

মুখ মচুকাইয়া লক্ষ্মী বলিল, “হাঁ, সে আবার বলবে ! সে যার দিদি বলতে অজ্ঞান ।”

নীচের ঠোঁটটা উল্টাইয়া অবজ্ঞার স্বরে বামুনদিদি বলিলেন, “ও, ভারী তো দরদ ! তোমার চেয়ে জাটুতো বোন হ’লো আপন !”

উপেক্ষায় মুখ বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “হোকগো দিদি আপন, আমি পরের মেয়ে পর হয়েই থাকি ।”

লক্ষ্মী চুল বাঁধা শেষ করিয়া উঠিল এবং পান সাজিয়া একটা নিজে খাইল আর একটা বামুনদিদিকে দিল । বামুনদিদি পান চিবাইতে চিবাইতে লক্ষ্মীর হাতে সাজা পানের অঙ্গুলি সূখ্যাতি করিতে লাগিলেন ।

এমন সময়ে পার্শ্বতী ঘুম হইতে উঠিল এবং বাহিরে আসিয়া বামুনদিদিকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, “বামুনদিদি যে ? কি ভাগ্যি !”

একমুখ হাসিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “ভাগ্যি বলে ভাগ্যি । আজ কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছিলে মনে ক’রে রেখো ।”

আমীর ঘর

হাসিতে হাসিতে পার্কতী বলিল, “তা রাখবো। কতক্ষণ এসেছো?”

বামুনদিদি বলিলেন, “যতক্ষণ তুমি ঘুমিয়েছ, ততক্ষণ। দিনের বেলা এত ঘুম কেন পার্কতী, রাতে নাতজামাই এসেছিল নাকি?”

পার্কতী হাসিয়াই উত্তর করিল, “তোমার নাতজামাই না আশুক, যে গরম এসেছিল, সে তো সারারাত চোখে-পাতায় করতে দেয়নি। তাই ভাত খেয়ে বড্ড আলিস্তি হ’লো, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তা বামুনদিদি এসেছে আমাকে ডেকে দিলি না কেন বৌ?”

লক্ষ্মী উত্তর দিবার পূর্বেই বামুনদিদি বলিলেন, “ও ডাকতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করলুম, বলি, খেটে-খুটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমুক।”

অতঃপর পার্কতী মুখে হাতে জল দিয়া লক্ষ্মীকে স্নানোদন করিয়া বলিল, “বামুনদিদিকে পান-টান দিয়েছিস?”

বামুনদিদি বলিলেন, “তা নিয়েছে। না, বেশ চালাক চতুর মেয়ে, কথায় বার্তায় কাজে কৰ্মে দিবিয়া গোছালো দেখছি।”

প্রশংসা-প্রফুল্লস্বরে পার্কতী বলিল, “তা আছে বামুনদিদি, নামেও যেমন লক্ষ্মী কাজেও তেমনি লক্ষ্মী। আমি যেমন চেয়েছিলাম তেমনিটা পেয়েছি।”

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে আশীর্বাদ করিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “আহা, বৈচে থাক—বৈচে থাক; পাকামাখায় সিঁদুর প’রে ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর, ঘরকন্না করুক।”

পার্কতী বলিল, “তাই আশীর্বাদ কর দিদি, তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ওদের হু’জনকে স্থানী দেখে আমি যেন যেতে পারি।”

আমীর খর

বামুনদিদি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুই কোথায় যাবি না ছুঁড়ি ! যাবার জন্তে তোর এত তাড়াই বা কিসের ! বাণীর পাচটা কাচ্চা-বাচ্চা হোক, তাদের মাছুষ কর। তারপর তোর নিজেরি কি কিছু হবে না, এমনিই কি চিরদিন যাবে ?”

একটু শ্লানহাসি হাসিয়া পার্বতী বলিল, “এর বেশী আবার আর কি দিন আসবে বামুন দিদি ? মরে যদি আবার জন্মগ্রহণ করি, তাহ'লে দিন ফিরলেও ফিরতে পারে।”

পার্বতীর চোখতুইটা সজল হইয়া আসিল। বামুনদিদি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “এত দুখ্য কভে হবে না। দেপিস, তোর দিন ফেরে কি না। তখন বলবি, হাঁ, সেই যে বামুনদিদি বলেছিল !”

বলিয়া বামুনদিদি সগর্বে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। পার্বতী শুধু নীরব মুহূহান্তধারাই বামুনদিদির এই গর্বোক্তি আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া লইল এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে আর একটা পান দিবার জন্ত লক্ষ্মীকে আদেশ দিল। বামুনদিদি পান লইয়া, বেলা যাইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্ত আসিয়া তিনি লক্ষ্মীর স্বভাবকুটিল হৃদয়ে যে হলাহল ঢালিয়া দিয়া গেলেন, তাহা তাঁহার আশীর্বাদকে ছাপাইয়া পার্বতীর সুখশান্তিকে দহন করিবার উপক্রম করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বামুনদিদি চলিয়া গেলে পার্শ্বতী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাঁশী ফেরেনি বো ?”

কাঁচি ধরিয়া সোনা পোকাকর টিপ কাটিতে কাটিতে লক্ষ্মী যেন নিতান্ত উপেক্ষার সহিত উত্তর করিল, “না ।”

পার্শ্বতী বলিল, “তাই তো, না-খাওয়া, না-দাওয়া, সারা দিনটা গেল, কখন ফিরবে ?”

বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিল, “যখন খুসী হবে তখন ফিরবে । আমি তার কি জানি বল ।”

তাহার এই রূঢ় উত্তরে পার্শ্বতীর একটু রাগ হইল, বলিল, “তুই আর কি জানিস্ বল । তুই জানিস্ কেবল খেতে, আর নিজের সাজ গোজ কত্তে ।”

লক্ষ্মী ফৌস করিয়া উঠিল ; কণ্ঠ পঙ্কমে তুলিয়া তর্জন করিয়া বলিল, “কোনুখানটার আমাকে সাজগোজ কত্তে দেখলে বল তো ? সাতদিনের পর আজ চুলটা বেঁধেছি, তাই বুঝি তোমার এত রিষ হ’য়েছে ! এর তরেই তো মাথা কাটুনার চুপড়ী হ’য়ে থাকলেও চুল বাঁধবার নামও করি না । তা ঝকঝকি হ’য়েছে চুল বেঁধেছি । এই নাও, মাথা খুলে ফেলছি ।”

লক্ষ্মী রাগে যেন কাঁপিতে কাঁপিতে কিপ্রহস্তে বাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিতে লাগিল । তাহার ক্রোধোদীপ্ত মূর্তি দর্শনে পার্শ্বতী ভীত

স্বামীর ঘর

ও অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লক্ষ্মী টানিয়া ছিঁড়িয়া চুলের বিনানী খুলিতে খুলিতে রাগে যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “আর যদি কখনো চুল বাঁধবার নাম করি ঠাকুরঝি, তবে আমার মুখে গুণে দশ কাঁটা মেরো। চুল বাঁধবার তরে এত খোঁটা! চুলোয় যাক, পোড়া চুলকে আজ কেটেই ফেলবো।”

সম্মুখে কাঁচিটা পড়িয়াছিল; লক্ষ্মী সেটাকে তুলিয়া বাঁ হাতে চুলের গোছা ধরিয়া তাহা কাটিয়া ফেলিতে উদ্বৃত্ত হইল। পার্শ্বতী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মীর কাঁচি-সমেত হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, শক্তিস্বরে বলিল, “করিস্ কি বোঁ, এয়োস্ত্রী মেয়ে, চুল কাটতে আছে?”

ফুলিতে ফুলিতে লক্ষ্মী বলিল, “খু-উ-ব আছে। ছেড়ে দাও তুমি, এয়োস্ত্রী ব’লে আর তোমার এত দরদ দেখাতে হবে না। পোড়া চুলের তরে এত লাঞ্ছনা! এঁ পোড়া চুলে আজ আমি আগুণ ধরাব।”

পার্শ্বতী তাহার হাত হইতে কাঁচিটা কাড়িয়া লইয়া তর্জ্জনসহকারে বলিল, “মুখ সামলে কথা কইবি বোঁ! তোর এত অসহ্য হয়, নিজে জলে ডুবে মর, গলায় দড়ি দে, কিন্তু যাতে বাঁশীর অকল্যাণ হয়, এমন কথা যদি বলবি, তা’হলে ভাল হবে না বলছি।”

যেন গভীর স্থগায় মুখখানাকে বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “মন্দটাই কি হবে শুনি? আমার সোয়ামীর ঘর, আমি এখানে বা খুসী তাই করবো, তোমার বলবার কি অধিকার আছে?”

পার্শ্বতী ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, “আমারও খুব অধিকার আছে। তোর সোয়ামীর ঘর, আমারও ভায়েক ঘর।”

স্বামীর স্বপ্ন

অবজ্ঞার ঠোটটাকে উল্টাইয়া শ্বেত-ভীষকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, “ওঃ, ভায়ের ধর ! তবু যদি খুড়তুতো ভাই না হ’তো !”

পার্কতীর মুখখানা যেন সাদা হইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সামলাইয়া লইয়া গর্জন করিয়া বলিল, “কে বললে তোকে খুড়তুতো ভাই ?”

“যে জানে সেই বলেছে।”

“বাণী বলেছে বুঝি ?”

“যদি সে বলেই থাকে।”

ক্রোধে, ক্রোধে, দুঃখে পার্কতীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে জ্বারে জ্বারে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, “আচ্ছা, আল্লহু আজ বৈশো—”

“বৈশো এই যে এসেছে দিদি।”

সহসা যদি সেখানে আকাশ হইতে একটা বাজ সগর্জনে আসিয়া পড়িত, তাহাতে পার্কতী এতটা চকিত হইত না, বাণীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া যতটা চমকিয়া উঠিল। সর্বনাশ ! বাণী কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব কথা শুনিয়াছে নাকি ? ছি ছি, রাগে জ্ঞান হারাইয়া পার্কতী আজ এ কি করিতেছিল ? বাণীকে সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া ? পার্কতীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে আর বাণীকে মুখ দেখাইবে না, ছুটিয়া গিয়া খিড়কী-পুকুরের জলে মুখখানা নুকাইয়া ফেলিবে।

বাণী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা বাণীর শাসন যা কস্তে হয় পরে ক’রো, এখন হাঁড়িতে ভাত থাকে তো দাও। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী চুঁয়ে যাচ্ছে।”

স্বামীর ঘর

লজ্জায় পার্শ্বতীর চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। সে আরক্তমুখে পাশ কাটাইয়া তাডাতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া আসিল।

আহারান্তে বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছিল দিদি?”

লজ্জিতভাবে পার্শ্বতী উত্তর করিল, “কি হবে আবার।”

বাণী একটু হাসিল; বলিল, “কিছু হয়নি তো শুধু শুধু বৈশোর ওপর পড়েছিলে কেন?”

কৃত্রিম কোপে তর্জ্জন করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “শুধু শুধু কি রকম? সেই কোন্ সকালে উঠে যাত্রা শুন্তে বেবিয়েছিলি—সন্ধ্যা হ’তে যায়, তবু দেখা নাই। সংসাবে কাজকর্ম কিছু নাই কি? যাত্রা শুন্লেই কি পেট ভরবে? না-খাওয়া, না-দাওয়া,—পিত্তি প’ড়ে যখন অস্থখ বিষ্ময় ক’বে, তখন ভুগতে হবে কা’কে?”

সহাস্ত্রে বাণী বলিল, “তোমাকে। তাই বুঝি আমার অসাক্ষাতেই আমাকে শাসন ক’চ্ছিলে?”

বলিয়া সে সহাস্ত্রদৃষ্টিতে পার্শ্বতীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার এই ন্লেষোক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পার্শ্বতীর বিলম্ব হইল না, বুঝিয়া লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বরে যতটা পারিল, ক্রোধের তীব্রতা আনিয়া প্রকৃটি করিয়া বলিল, “এর আর অসাক্ষাতে কি? আমি কি তোকে ভয় ক’রে কথা কই?”

বাণী এ কথার উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পার্শ্বতী রাগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না বাণী, তোরা যদি এ রকম করিস, তা হ’লে আমি পেরে উঠবো না।”

বাণী মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

আমীর খয়র

“পেরে উঠবো না বললে তো চলবে না দিদি, পেরে উঠতেই হবে তোমাকে।”

কোথ-সমুচ্চকণ্ঠে পার্শ্বতী বলিল, “কেন বল তো, আমি কি এমন দায়ে পড়েছি যে, প’ড়ে প’ড়ে এত জানা আমাকে সহিতে হবে? খুড়তুতো ভাই, আর আটুতুত বোন,—এ ছাড়া তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?”

হাসিয়াই বাণী উত্তর করিল, “ঐ টুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নাই।”

তাহা হইলে বাণীও ঐটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কই স্বীকার করে না? তবে বোয়ের দোষ কি? অভিমানে দুঃখে পার্শ্বতীর বুকটা ফুলিয়া উঠিল। অভিমান-স্বকণ্ঠে বলিল, “আর কিছু নাই যদি, তবে ঐটুকু সম্পর্কও আমি আর রাখতে চাই না।”

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “না রেখেই কি করবে?”

গর্জন করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “কি করবো? আমার যা খুসী, তাই করবো, যে দিকে ছ’ চোখ যায়, চ’লে যাব।”

একটুও আশঙ্কার ভাব না দেখাইয়া বাণী বেশ পরিষ্কার কণ্ঠেই বলিল, “তা যেতে পার।”

ও ভগবান, বাণীর এই উত্তর। পার্শ্বতীর চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল, কোথো কোভে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কি বলিবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার ভাবিয়া উত্তর দিবার পূর্বেই লক্ষ্মী তথায় উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নতার সুরে বলিল, “যেতে হয় ভাল দিন-ক্ষণ দেখে এর পর যেও ঠাকুর-বি, এখন ভর-সন্ধ্যাবেলায় জাই বোনে ঝগড়া ক’রে ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দিও না।”

স্বামীর ঘর

লক্ষ্মীর এই তীব্র স্নেহোক্তি যেন তপ্ত শলাকার ছায় আসিয়া পার্বতীর মর্মে বিঁধিল। হা কপাল ! পার্বতী বাণীর ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দিতে উদ্ভত হইয়াছে আর বৌ তাহাকে আগ্লাইয়া রাখিবার জন্ত ছুটিয়া মধ্যস্থতা করিতে আসিয়াছে। পার্বতীর মাথার ভিতর যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল; রাগে ফুলিতে ফুলিতে ক্রোধকণ্ঠ কণ্ঠে ডাকিল, “বাণী !”

বাণী এ আহ্বানের কোন উত্তর দিল না, নীরবে বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার মুখে হাসি দেখিয়া পার্বতী আরও রাগিয়া উঠিল এবং রাগে জ্ঞানহারী হইয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, “আচ্ছা বৌ, তোদের ঘরের লক্ষ্মীকে তোরা আগলে রাখ, আমি অলক্ষ্মী—আমি এই দণ্ডেই—”

পার্বতী কথা শেষ করিতে পারিল না, ছুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবেগ রোধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া পার্বতী সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু সে পলাইতে পারিল না। ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দরজা হইতে ডাক আসিল, “বাণী, ওহে বংশীবদন ?”

সে ডাক শুনিয়া পার্বতী চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল ! সঙ্গে সঙ্গে কালচাঁদ বাতীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, “বাণী কোথায় হে ?”

পার্বতী উৰ্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বাণী ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া আসিয়া কালচাঁদকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কানাচাঁদ বলিল, “খোকার ভাত, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে পার্কর্তি !”

চিন্তিতভাবে পার্কর্তী বলিল, “এদের ফেলে আমি কি ক’রে যাই বল ।”

কানাচাঁদ হাসিয়া বলিল, “কেন, এখন তো তোমার বাঁশীকে হাত পুড়িয়ে রেখে খেতে হবে না ? তাকে রেখে দেবার লোক তো এনে দিয়েছি ।”

পার্কর্তীও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তা দিয়েছ, কিন্তু—”

কানাচাঁদ বলিল, “কিন্তু তুমি না গেলে বড়ই মনঃকষ্ট হবে পার্কর্তি ! বিশেষ, যার ছেলের ভাত, তার তো দুঃখের সীমা থাকবে না । তোমাকে নিয়ে যাবার তরে সে তো আজ দশদিন ধ’রে আমাকে বাড়ীতে তিষ্ঠতে দেয় না ।”

একটু কৌতূকের হাসি হাসিয়া পার্কর্তী বলিল, “ভাগ্যে সে এত ক্ষেদ ধরেছিল, তাই পথ ভুলে এসে পড়লে ।”

অপ্রতিভাবে কানাচাঁদ বলিল, “পথ ভুলে নয় পার্কর্তী, আসবো আসবো মনে করি, কিন্তু চাষ-বাস, নানান ঝগাট,—আসি আসি ক’রেও আসা হয় না !”

পার্কর্তী বলিল, “সেইজন্তেই তো বলছি, দ্বিতীয়পক্ষের জোর হুকুম নাহ’লে সে সব ঝগাট ঠেলে বোধ হয় এখানে আসতে পারতে না ।”

স্বামীর ঘর

সলজ্জ হস্তসহকারে কালাচাঁদ বলিল, “সেকথা বড় মিথ্যে নয় পার্শ্বতি ! তা যে কারণেই হোক, এসে পড়েছি তো। এখন তোমার যাওয়ার কি হবে বল দেখি ?”

একটু ভাবিয়া পার্শ্বতি বলিল, “যেতে পারলে ভাল হ’তো ; তোমার দ্বিতীয়পক্ষকে—বিশেষ খোকাকে দেখতে বড়ই সাধ হয়। কিন্তু কি ক’রেই বা যাই ?”

মাথা নাড়িয়া কালাচাঁদ দৃঢ় অন্তরোধের স্বরে বলিল, “যে ক’রেই হোক, অন্ততঃ দুদিনের জন্তও তোমাকে যেতেই হবে। না গেলে—”

পার্ক। না গেলে কি হবে ?

কালা। না গেলে মনে করতে পারে, সত্যিনের ছেলের ভাত ব’লে হিংসায় তুমি গেলে না।

পার্ক। তাতে আমার ক্ষতি কি ? আমার মনে তো সত্যি হিংসা নাই !

কালা। তোমার মনে যে হিংসা নাই, তা আমি জানি। আর জানি ব’লেই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্ত আমার এত জেদ।

পার্কতি কোঁতুহলাষিতদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। কালাচাঁদ বলিল, “জানি যখন স্থির জানি, তোমার মনে হিংসা নাই, তখন আর কেউ যে সে ধারণাটা মনে স্থান দেবে, সেটা আমার সম্বন্ধ হবে না।”

স্বামীর কথায় পার্কতীর মুখখানা একটা অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়টা আপনা হইতেই প্রেমময় স্বামীর চরণেই যেন আনত হইয়া পড়িল। ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “আমার ওপর যে এখনো তোমার খুব চান আছে দেখছি।”

স্বামীর ঘর

তাহার মুখের উপর প্রীতি-প্রফুল্লদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কালাচাঁদ বলিল, “এ টান যে জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গিয়েছে পার্কীতি ! জীবন থাকতে কি এ টান যাবে !”

আনন্দের আতিশয্যে পার্কীতীর বুকটা ছুরু ছুরু করিতে লাগিল, এমন প্রেমময় স্নেহপ্রবণ স্বামীর সম্মুখে সে আর মাথা উচু করিয়া থাকিতে পারিল না, স্বামীর প্রতি স্বীয় কঠোর ব্যবহার স্বরণে লজ্জায় তাহা আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। এমন স্বামীর সাগ্রহ আহ্বান বার বার প্রত্যাখান করিয়া সে যে ভয়ানক দুর্কর্ম করিয়াছে তাহা স্বরণে তাহার যেন আজ অম্লতাপ উপস্থিত হইল। হায়, সে যে নিজের দোষে নিজের ঘরকে পরের ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন স্বামীকে পরের হাতে বিলাইয়া দিয়াছে। এখন আবার কোন্ মুখে স্বামীর ঘরে যাইবে !

কালাচাঁদ বলিল, “আমি বডমুখ ক’রে তোমাকে নিতে এসেছি, তুমি যাবে না পার্কীতি ?”

পার্কীতী নতমুখে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “না।”

“কেন যাবে না ?”

কালাচাঁদের স্বরটা যেন ব্যাকুলতার ভরা। সে স্বরে পার্কীতীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠ উদ্গতবাশ্পে সজল হইয়া আসিল। কিন্তু জোর করিয়া স্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা আনিয়া উত্তর দিল, “যেতে পারবোনা।”

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালাচাঁদ বলিল, “বুঝেছি, তুমি আমার ঘরে আর যাবে না। কিন্তু আমি কি দোষ করেছি পার্কীতি ?”

আমীর ঘর

পার্কীতী ধপ্ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল; আবেগ রুদ্ধ কর্তে বলিল, “ওগো, দোষ তোমার নাই, দোষী আমি নিজে। জগতে যদি কোথাও আমার মাথা রাখবার ঠাই থাকে, তবে সে তোমার ঘর। কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারবোনা, আমাকে তুমি যেতে ব’লোনা।”

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েকবিন্দু তপ্ত অশ্রু কানালার পায়ের উপর পড়িল। কানালার সচকিতে পা সরাইয়া লইয়া দ্বিভ্রাসা করিল, “তুমি কাঁদচো পার্কীতী?”

“না” বলিয়া পার্কীতী চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কানালার বাঁহাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, “তুমি এখন না যাও না যাবে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা ব’লে রাখি পার্কীতী! আমার ওপর তোমার যতই দুঃখ যতই অভিমান থাক, আমার ঘর তোমার নিজের ঘর; আর ভায়ের ঘর—তুমি যতই আপন ব’লে ভাব, সেটা হচ্ছে পরের ঘর।”

পার্কীতী নতমুখে দাঁড়াইয়া আঙ্গুল মটকাইতে লাগিল। কানালার বলিল, “একটা মেয়েলি কথা আছে, ‘ভায়ের ভাত, ভাজের হাত।’ ভাই আপনার, কিন্তু ভাজ পরের মেয়ে, তার সঙ্গে চিরকাল বনিবনাও হ’তে পারে না।”

চিরকালের কথা দূরে যাক, এখনই যে বনিবনাও হয় না! কানালার কি সর্বজ্ঞ? তাহার এই তীক্ষ্ণদর্শিতায় পার্কীতী মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেও মুখে কিন্তু সেকথা স্বীকার করিতে পারিল না; ক্রুদ্ধিত ললাটে ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিল, “যদি বনিবনাও না

স্বামীর ঘর

হয়, এখানে ভাত এক মুঠো না পাই, তখন তোমার ঘর তো রদ্বৈছেই।”

কালচাঁদ হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, “একেই বলে মেয়েমানুষ! আমি কি তোমাকে পেটের ভাতের কথা বলছি? ভিক্ষা ক’রেও লোকে পেটের ভাতের যোগাড় করে।”

ক্রকুটী করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “ভাতের ভাত ঠিক ভিক্ষার ভাত নয়।”

সহান্ত্রে কালচাঁদ বলিল, “কিন্তু স্বামীর ভাতের মত জোরের ভাতও নয়। তার ওপর—”

বক্তব্য শেষ না করিয়াই কালচাঁদকে থামিতে দেখিয়া পার্শ্বতী দ্বিচ্ছিন্না করিল, “তার ওপর কি?”

কালচাঁদ বলিল, “রাগ ক’রো না পার্শ্বতী, তার ওপর বাঁশী তোমার সহোদর ভাই নয়।”

তাহার মুখের উপর তিব্বতীয়পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জোরগলায় পার্শ্বতী উত্তর করিল, “বাঁশীকে আমি সহোদর ভাই ব’লেই মনে করি।”

কালচাঁদ শান্ত গভীরকণ্ঠে বলিল, “সহোদর ভাই কেন, বাঁশীকে তুমি পেটের ছেলের চেয়েও বেশী আপন মনে কর! কিন্তু তুমি মনে কর ব’লে—”

তাহার কথায় বাধা দিয়া পার্শ্বতী বলিয়া উঠিল, “বাঁশীও দিদি ভিন্ন কিছু জানে না।”

“আর তার বোঁ?”

“সে কোথাকার কে?”

আমীর ঘর

“বড় কোথাকার কে নয়, সে বাশীর জী।”

“রোধ তীব্রকণ্ঠে পার্কর্তী বলিয়া উঠিল, “তুমি কি আমাদের ভাই-বোনের মধ্যে মনোবিচ্ছেদ ঘটাতে এসেছ ?”

কালচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, “তাতে আমার লাভ ?”

কর্কশকণ্ঠে পার্কর্তী উত্তর করিল, “বোধ হয় তোমার দ্বিতীয়পক্ষের চাকরাণী বা রাধুনীর দরকার হয়ে পড়েছে।”

কালচাঁদের মুখখানা কালো মেঘের মত অন্ধকার হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা মুহূর্তের জগ্ন, মুহূর্তপরেই সে আবার হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে দীর্ঘ প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, “তা নয় পার্কর্তি, তুমি আমার জী বলেই তোমাকে এত কথা বুঝিয়ে বলছি। তোমাকে লাঞ্ছনা বা অপমান ভোগ কন্তে হ’লে তাতে আমারও লাঞ্ছনা, আমারও অপমান।”

শ্লেষ-তীব্রস্বরে পার্কর্তী বলিল, “সত্যি ?”

কালচাঁদ বলিল, “সত্যি মিথ্যে তুমি তোমার নিজের মন দিবেই বুঝে দেখতে পার। ধর, আমার সঙ্গে তোমার এখন কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু কা’ল যদি শোনো, আমার কঠিন অস্থখ হয়েছে, আমি বাঁচবো না—”

সকোপদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তর্জনসহকারে পার্কর্তী বলিল, “আমি তোমার কথা শুনতে চাই না।”

বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া ক্রোধ-গভীরপদক্ষেপে প্রস্থানোত্তত হইল। কালচাঁদ হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, আমার ককুখনো অস্থখ-বিস্থখ হবেনা, আমি চিরকাল অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাকবো। এখন আমার এলটা কথা শুনে যাও।”

আমীর ঘর

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পার্কতী জিজ্ঞাসা করিল, “কি কথা বল।”

কানাচাঁদ বলিল, “আমার অহুরোধে—আমার সন্তোষের জন্য এক দিনের তরেও কি তুমি যেতে পারবে না?”

দৃঢ়স্বরে “না” বলিয়া পার্কতী বেগে কক্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইল। কানাচাঁদ স্নানমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সকালে বাড়ী ঘাইবার সময় কানাচাঁদ বাঁশীকে ডাকিয়া বলিল, “কি হে বাঁশী, খোকার ভাতে তোমার দিদি তো যেতে পারবে না, তুমি যাবে কি?”

মস্তক আন্দোলনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বাঁশী উত্তর করিল, “হু”, খুব যেতে পারবো।”

কানাচাঁদ তখন ঘাইবার জন্য বাঁশীকে বারবার অহুরোধ করিয়া প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বেণী পিসীকে সন্মোদন করিয়া বলিল, “হাঁ পিসি, সৃষ্টিশুদ্ধ লোকের বিয়ে হ’য়ে গেল, আর আমিই কি চিরকাল আইবুড়ো হ’য়ে থাকবো?”

একটু রাগতভাবে পিসী বলিলেন, “তুই চিরকাল আইবুড়ো থাকবি কেন? বিয়ে করলেই তো পারিস। আমি তোকে বিয়ে কন্তে ধ’রে রেখেছি?”

ছায়াবীর ঘর

বেণী বলিল, “ধরেও রাখনা, বিয়ের কোন চেষ্টাও করনা।”

কুম্বন্ধরে পিসী বলিলেন, “আমি মেয়েমানুষ, আমি কি চেষ্টা করবো বলতো?”

মুখ খিঁচাইয়া বেণী বলিল, “ও, ভারী-ই মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ বলে চেষ্টা কত্তে নাই কি? এই যে বাঁশীর বোন, সেও তো মেয়েমানুষ, —সে চেষ্টা করে বাঁশীর বিয়ে দিলেনা?”

পিসী। তার পয়সার জোর ছিল, আমার পয়সা কোথায়?

বেণী। কেন, তোমার পয়সা কি হ'লো? পয়সায় আগুন লেগে গেল না কি?

তর্জনসহকারে পিসী বলিলেন, “পয়সায় আগুন লাগবে কেন, যে ছ'পয়সা ছিল, তা তোর পেটেই দিয়েছি। তুই যদি মানুষ হতিস, ছ'পয়সা রোজগার কত্তে পারতিস, তাহ'লে আজ তোর বিয়ের ভাবনা কি?”

গভীরভাবে বেণী বলিল, “বাঁশীর চেয়ে আমি অক্ষম না কি? না তার চেয়ে লেখাপড়া কম জানি। আমি মনে করলে মাসে একশো টাকা রোজগার কত্তে পারি, তা জান?”

পিসী। পারিস্ তো করিস্ না কেন?

বেণী। কেন করি না, তুমি তার কি বুঝবে? পরের গোলামী আমি কত্তে পারবো না।

পিসী। তা পারবি কেন, পারবি শুধু ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে। গোলামী না করলে পয়সা রোজগার হবে কোথা হ'তে?

বেণী। পয়সা রোজগার কেবল গোলামীতেই হয় নাকি? তুমি তো কিছু বোঝনা। পিসীমা, এই গোলামী ক'রেই দেশটা উদ্ধরে গেল।

আমার স্বপ্ন

শ্রেষ্টের স্বপ্নে পিসীমা বলিলেন, “তা গেল বৈ কি ! ঐ যে চুণি হাজরা গোলামী ক’রে একমাসে একশো-দেড়শো টাকা রোজগার কচ্ছে, তোর পিসে গোলামী ক’রে কিছু রেখে গিয়েছিল ব’লেই তুই মাহুষ হ’লি।”

হুঃখ-গন্তীরমুখে বেণী বলিল, “তোমাকে এসকল কথা আমি বোঝাতে পারবো না। তুমি তো খবরের কাগজ পড়নি, দেশের কোন খবরও রাখ না। তুমি খবর রাখ কেবল পুকুরঘাটের, আর ভাতের হাড়ীর।”

বেণীর কথায়, পিসীমার হাসি আসিল। তিনি হাসি চাপিয়া বলিলেন, “তা ভাতের হাড়ী ছেড়ে আমি রাজ্যিগুরু খবর রাখবো নাকি ?”

হুঃখিতভাবে বেণী বলিল, “রাখাই তো উচিত। আর তা রাখতে পারলে তুমি জানতে যে দেশের হাওয়া ফিরে গিয়েছে, সে গোলামীর কাল—“আপকা-ওয়ান্তের” যুগ আর নাই ! এখন দেশের সর্বত্র স্বাধীনতাব ছায়া, গোলামী ছেড়ে সকলেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জগৎ বন্ধপরিকর হয়েছে। এখন সকলেই চায়, স্বাধীন ব্যবসা, স্বাধীন কাজ।”

পিসী বলিলেন, “তা তুইও তেমন কাজ করলে পারিনু ?”

সগর্বে মন্তকসঞ্চালন করিয়া বেণী বলিল, “আমিও তা কববো না মনে কর নাকি ? দিনকতক সবুর কর না, বাবা আগে চোক বুজুক। তারপর ঐ সব জমি নিয়ে আমি ‘এগ্রিকালচারের’ উন্নতি কি রকমে কস্তে হয়, তা দেখিয়ে দেব।”

বেণীর উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পিসী ত্রিভাষ্য করিলেন, “সে আবার কি রে ?”

স্বামীর ঘর

বেণী বলিল, “এগ্রিকালচার—চাষ, চাষ।”

পিসী। ওঃ, চাষ করবি?

বেণী। হাঁ, চাষ করবো। কিন্তু যেমন তেমন চাষ নয়, ‘সায়ান্টিফিক্’ প্রক্রিয়ায় চাষ। তাতে হবে কি জ্ঞান? দেশের মধ্যে একটা বিস্ময়ের সাড়া পড়ে যাবে, এখন যে জমিতে দশমণ ধান হয়, সেই জমিতে দু’শোমণ ধান হবে। এখন যাতে পাঁচমণ কলাই জন্মে, তখন সেই জমি হ’তে পাঁচশোমণ কলাই পাওয়া যাবে।

বিস্ময়ে অবাক হইয়া পিসী বলিলেন, “বলিস কিরে বেণী, তাও কি কখন হয়?”

গর্ভপ্রদীপ্ত মুখে বেণী বলিল, “হয় কি না হয় দেখিয়ে দেব। যদি বেঁচে থাক পিসি, তবে তখন বলবে, হাঁ, বেণীর মুখেও যা, কাজেও তাই।”

বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে ভ্রাতৃপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া পিসী আত্মলাভে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, “আহা, তাই হোক বাছা, তাই হোক! ভগবান্ কি তেমন দিন করবেন?”

বিরক্তিতে ঋকুণ্ডিত করিয়া বেণী বলিল, “ভ্যাম্ ভগবান্! যারা মূর্খ চাষা, তারাই ভগবান মানে, অদৃষ্টের দোহাই দেয়। আমি ওসব মানি না, আমি মানি নিজের চেষ্টা—নিজের অধ্যবসায়; ট্রাই এগেন্—ট্রাই এগেন্। ভগবানের ক্ষমতা কি? আমি চেষ্টা না করলে ভগবান্ কি আমাকে দিতে পারে?”

বেণীর এই নাস্তিকতায় শঙ্কিত হইয়া পিসী ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, “অমন কথা কি বলতে আছে বাবা, ‘ভগবানের দয়া না হ’লে কি কিছু হয়?”

স্বামীর ঘর

ক্রুদ্ধভাবে বেণী বলিল, “রেখে দাও তোমার ভগবানের দয়া। ভগবান্ কাল আমাকে দশহাজার টাকা দিক্ দেখি?”

পিসী বলিলেন, “তা তিনি মনে করলে কি না কত্তে পারেন? তিনি ভিত্তারীকে রাজা, রাজাকে ভিত্তারী করেন।”

রাগে মুখ খিঁচাইয়া বেণী বলিল, “হাঁ করেন! ঐ এক কেমন তোমাদের দোষ, ‘সেল্ফ ডিপেন্ডেন্স’—স্বাধীনতাকে কিছুতেই তোমরা মাথা তুলতে দেবে না, খেতে শুতে পরতে পরাধীনতা। তা এটা শুধু তোমার দোষ নয় পিসি, এই পরাধীনতা রোগটা দেশের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে।”

দেশের দুর্ববস্থা-স্বরূপে বেণী বিবাদগম্ভীরমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আর পিসী ভ্রাতৃশুভ্রের এই নাস্তিকতা দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে ভগবানের নিকট তদীয় অপরাধ মার্জনা প্রার্থনা করিলেন।

বেণী কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া পিসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “হাক্, এখন বে কথা বল্ছিলাম। বিয়ের চেষ্টা তুমি কববে কি না বল দেখি?”

চিন্তিতভাবে পিসী বলিলেন, “চেষ্টা করবো না কেন, কিন্তু টাকা চাই তো। যেমন হোক দু’একখান গয়না দিতে হবে, ঘর-খরচও কিছু আছে। এসব আসবে কোথা থেকে?”

রাগে জ্বকুটী করিয়া বেণী বলিল, “চুনো থেকে আসবে। কেন, তোমার হাতে কি দু’একশো টাকাও নাই?”

আক্ষেপ সহকারে পিসী বলিলেন, “হায় হায়, দু’টো টাকা নাই; দু’একশো টাকা হাতে থাকলে কি এই বয়সে আমাকে গতর খাটিয়ে পেট চালাতে হয়?”

আমীর খর

ক্রোধগম্ভীৰস্বৰে বেণী বলিল, “ঐ পেটেই আগুন লেগেছে। রাগ ক’ৰোনা পিসীমা, তুমি একা যা খাও, তাতে তিনটে লোকের পেট চ’লে যায়। এত খাওয়ায় কি হাতে পয়সা থাকে ?”

ভাতুশুভ্ৰেৰ কথাৰ অস্ত্ৰে নিদাৰুণ আঘাত পাইয়া দুঃখবিমলিনমুখে পিসী বলিলেন, “আমি একাই খাই রে বেণী, তুই খাস না ? তুই ছ’বেলা খাস, আমাৰ এক বেলা এক মুঠো।”

মাথা নাড়িয়া বেণী বলিল, “ঐ একবেলাতেই তুমি সাতবেলাৰ খাওয়া খেয়ে নাও। চুলোয় যাক, তোমাৰ আৰ বিয়েৰ চেষ্টা দেগতে হবেনা, পাৰিতো নিজের চেষ্টাতেই বিয়ে কৰবো।”

পিসী বলিলেন, “সে তো বাছা খুব ভাল কথা !”

বেণী বলিল, “ভালই হোক আৰ মন্দই হোক, দেগ, এক বছরের ভিতৰ বিয়ে কত্তে পাৰি কিনা। বাণীৰ সঙ্গে যুক্তি কৰেছি, একটা কাৰবার কৰবো।”

পিসী জিজ্ঞাসা কৰিলেন, “কি কাৰবার রে বেণী ?”

বেণী বলিল, “খুব ভাল কাৰবার। লোকসানের ভয় একটুও নেই, বোল আনা লাভ। এখানে তেঁতুলের দব কত বল দেখি ?”

পিসী। দেডপয়সা ছ’পয়সা সের।

বেণী। কিছু কলকাতায় তার দর চার আনা পাঁচ আনা। দেশ থেকে তেঁতুল কিনে কলকাতায় চালান দেব। ধর, এখানে একটাকা মণ তেঁতুল কিনে যদি চালান দিই, সেখানে বিক্রী হবে পাঁচ টাকা মণ। ধরচ-খরচা বাদ দিলেও লাভ থাকে মণকরা অস্ততঃ তিন টাকা। মাসে যদি একশোমণ তেঁতুল চালান দিতে পাৰি, তাহ’লে তিনশো টাকা তো বাক্সেব মধ্যে।

আমীর ঘর

প্রচুর লাভের আশায় পিসী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “তা বুদ্ধি খাটিয়ে কারবার করতে পারলে কি আর লাভ হয় না? তবে তেঁতুল কিনতে তো টাকা চাই?”

বেণী বলিল, “কত টাকার দরকার? শ-তিনেক টাকা নিয়ে বসলেই খুব চলে যাবে। বাঁশীর টাকা আর আমার বুদ্ধি। কা’ল যাত্রা শুনতে গিয়ে ছুজনে এই যুক্তি ঠিক ক’রে ফেলেছি। বাঁশীও ব’সে ব’সে খায় ব’লে তার দিদি সময়ে সময়ে দু’কথা শুনিয়া দেয়, বৌটিও নিষ্কর্মা ব’লে তিরস্কার করে। তাই বাঁশীরও জেদ, বে উপায়ে হোক দশ টাকা রোজগার করে।”

চিন্তিতভাবে পিসী বলিলেন, “তা বাঁশীই বা এত টাকা পাবে কোথায়?”

বেণী বলিল, “সে তার দিদির কাছ থেকে যোগাড় করবে। না হয় বোয়ের গয়না বাঁধা দেবে।”

পিসী বলিলেন, “কিন্তু দেখিস্ বাছা, কারবার কত্তে গিয়ে শেষে যেন দেন্দার হ’য়ে পড়িস্ না।”

বেণী হাসিয়া উঠিল, বলিল, “তুমি যেমন পাগল, আমি হচ্ছি শূত্র - বগরাদার, আনার ভাগে শুধু পাওয়া, দেনা হয়, বাঁশীর হবে! তুমি কি আমাকে এমনি নির্কোষ মনে করেছ পিসি?”

সাহ্লাদে পিসী বলিলেন, “না বাছা, গোড়া থেকেই তো তোকে চালাক-চতুর বলেই জানি। তা তুই কারবার করবি কর, আমিও এদিকের মেয়ের চেষ্টা দেখি। তুই কি মনে করিস্ বেণী, তুই এমন বাউণ্ডলে হয়ে বেড়াচ্ছিস্, আমার সেটা দেখতে ভাল লাগছে? আমারও কি বৌ-মুখ

আমীর খর

দেখতে সাধ নাই ? তোকে সংসারী দেখে যেতে না পারলে আমার কি মরণেও সুখ আছে বেণী !”

স্নেহের উদ্দেশ্যে পিসীমার চক্ষু সজল—কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল ; বেণীও তাহার এই স্নেহে মুগ্ধ হইয়া হর্ষ-প্রফুল্ল-মুখে বলিল, “আমিও কি তা না জানি গিসি, আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে ?”

তখন পিসী-ভাইপোর মধ্যে আপোষ হইয়া গেল। পিসী ভাইপোর জ্ঞান ও ভাইপো পিসীর জ্ঞান সর্বদা কতটা চিন্তিত, উভয়ে তাহাই ব্যস্ত করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাণী নিমজ্জনরক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং আসিয়া সরকার মশায় ও তদীয় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মধুব ব্যবহার পার্শ্বতীর নিকট কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল। পার্শ্বতী খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিল ; খোকা কেমন হইয়াছে, বসিতে পারে কিনা, দাঁত বাহির হইয়াছে কি হয় নাই, বেশী কাঁদে কিনা ইত্যাদি অনেক কথা বাণীর নিকট হইতে আগ্রহসহকারে জানিয়া লইল। পার্শ্বতী নিজেব হাতের দুই গাছা চুড়ী ভাঙিয়া খোকার গলার একটা পদক গড়াইয়া দিয়াছিল, এবং তাহার এক পিঠে খোদাই করিয়া লইয়াছিল, ‘খোকার মা’। সেই পদক দেখিয়া সরকারমশায় কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, খোকার মা খোকার গলায় সেই পদক ঝুলাইয়া দিয়া সগর্বে তাহা সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছিল, এবং পার্শ্বতীকে প্রকৃতপক্ষে খোকার মা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল,

আমীর ঘর

তাহা ব্যক্ত করিয়া বাঁশী দিদিকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। খোকার কথা—খোকার মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে পার্শ্বতীর বুকে যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিল। সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে ও সপত্নীবিদ্বেষবর্জিতা সুরলপ্রাণা খোকার মাকে একবার দেখিবার জন্ত চিত্তটা উৎসুক হইয়া উঠিল।

পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ রে বাঁশী, আমি বাইনি ব’লে কেউ কিছু বললে?”

বাঁশী বলিল, “বলেনি আবার? রমা-দিদি আমার কাছে দুখ্য কত্তে লাগলো।”

পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “রমা-দিদি কে রে?”

তাহার এই অজ্ঞতায় বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বাঁশী বলিল, “বাহবা, তাও বুঝি জাননা? খোকার মা। খোকার মায়ের নাম যে—রমা। তা রমা-দিদি আমাকে দাদা বলতো, আমিও তাকে রমা-দিদি বলতাম। রমা-দিদি কিন্তু চমৎকার মেয়ে। কি আদর, কি যত্ন, যেন মায়ের পেটের ভাই। যেটা সবচেয়ে বড় মাছের মুডো, সেটা দাদার পাতে, সব চেয়ে সরেশ সন্দেশ যা, তাই দাদার জলখাবার। মাইরি দিদি, আমার আরো দিনকতক থাকতে ইচ্ছা ছিল।”

হাসিতে হাসিতে পার্শ্বতী বলিল, “তা থাকলি না কেন?”

বাঁশী বলিল, “থাকতাম, কিন্তু কুটুমবাড়ী, তার ওপর সেই বুড়ী পিসীটার খ্যাখ্যাঝানি আমার মোটেই ভাল লাগতো না।”

কুণ্ডিতললাটে পার্শ্বতী বলিল, “চলোয় যাক বুড়ী পিসী! এখন তোর রমা-দিদি তোর কাছে কি দুখ্য করলে, তাই বল।”

বাঁশী বলিল, “কত দুখ্য। সব কথা কি আমার মনে আছে? রমাদিদি

স্বামীর ঘর

বলিল, “হাঁ দাদা, আমিই না হয় দিদির পর, কিন্তু ছেলেটা তো পর নয়!; তাকে একবার দেখতে, তাকে আশীর্বাদ কন্তেও কি একবার আসতে পারলে না? আমি তো জানতুম, খোকার ভাতে দিদি না এসেই থাকতে পারবে না। কিন্তু উনি যখন এসে বললেন, দিদি আসবেনা, তখন এমনি ইচ্ছা হ’লো আমি নিজে একবার ছুটে যাই, না হয় মরবার থাকলে আমি মরি। আমি না ম’লে তো দিদি আসবে না। বলতে বলতে মাইরি দিদি, সে কৈদে ফেললে।”

পার্বতীও তখন কান্নাটা কিছুতেই চাপিতে না পারিয়া, বিড়ালে কডায় দুধ খাইতেছে কিনা জানিবার জন্ত ছুটিয়া বাগাঘরে ঢুকিল, এবং সেখানে একটু দাঁড়াইয়া কান্নাটা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বাঁশীর কাছে আসিয়া বসিল।

বাঁশী বলিল, “না দিদি, তোমার ওখানে না-যাওয়াটা ভাল হয়নি।”

মুখে খানিক রাগের ভাব আনিয়া তর্জনসহকারে পার্বতী বলিল, “ভাল তো হয়নি, কিন্তু আমি যাই কি ক’রে বল দেখি? তোরা কি আমার কোথাও যাবার উপায় রেখেছিস?”

বাঁশী বলিল, “কেন দিদি, তুমি গেলে আমরা কি তোমায় ধ’রে রাখতুম?”

পার্বতী ভারীমুখে বলিল, “ধরে রাখবি কেন, আমাকে তো সবস দিক্ বিবেচনা ক’রে ধেতে হবে, এ তো আর কুটুন্নিতে কন্তে যাওয়া নয়?”

মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, “তা তুমি হু’দিনের জন্তে গেলে কি অটিকে যায়?”

আমীর ঘর

ওরে বাণী, একদিন তোর দিদিকে ছেড়ে একবেলাও কাটতো না, কিন্তু এখন ছুঁচার দিন ছেড়ে দিলেও আটকাই না। বটে রে নিমক-হারাম! এখন বৌ হয়েছে কিনা, এখন আর দিদিকে দরকার কি? অভিমানক্লককণ্ঠে পার্বতী বলিল, “বেশতো, আটকাই না যদি, তাহ’লে ছুঁদিন কেন ছুঁমাস আমি সেখানে গিয়ে থাকি না।”

বাণী বলিল, “থাকতে পার যদি, তাহ’লে স্বচ্ছন্দে গিয়ে থাক না।”

পার্ব। আমি কেন থাকতে পারবোনা? সে তো আমারি ঘর, তোরা থাকতে পারবি তো?

বাণী। না পারি, তোমার কাছে যাব।

পার্ব। আমার কাছে আবার যাবি কেন?

বাণী। না থাকতে পারলেই যেতে হবে।

পার্বতী এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, “তুই যত থাকতে পারবি, সে আমি জানি রে বাণী, জানি! বাড়ীতে এসে যদি দিদিকে একদণ্ড না দেখতে পাস, তবে চারিদিক অন্ধকার দেখিস্।”

বাণী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার মুখের উপর হান্তপ্রফুল্ল দৃষ্টিস্থাপন করিয়া পার্বতী বলিল, “সত্যি বাণী, এ তোর ভারী অগ্নায়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ভাগরটি হয়েছিল, বিয়ে হয়েছে, বৌ ঘরে এসেছে, এখনো কি সেই ছেলেমানুষটির মত দিদির আঁচল ধরে থাকবি?”

বাণী এবার একটু রাগতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “আচ্ছা আচ্ছা, আর আমি আঁচল ধ’রে থাকবো না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার।”

স্বামীর ঘর

পার্কী বলিল, “বেশ, এই কথাতো ! তাহ’লে আমি এক জায়গাতেই প’ড়ে থাকি কেন ? এখানে হু’মাস থাকি তো সেখানে হু’মাস থাকবো।”

ঈশ্বর হামিয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “কবে যাবে ?”

পার্কী বলিল, “যেদিন হয়। সত্যি বাঁশী, গোকাকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়।”

বাঁশী বলিল, “সাধ হয়, একবার দেখে এসনা। ভাল কথা, রমা-দিদি কি বলেছে জান ?”

পার্কী। কি বলেছে রে !

বাঁশী। বলেছে যে, তুমি যদি না যাও, রমা-দিদি নিজে থোকাকে নিয়ে এখানে আসবে।

পার্কী। হ্যাঁ, আসবে।

বাঁশী। তামাসা নয় দিদি, সত্যিই আসবে। বলেছে, দিদি যখন এসে পায়ের ধুলো দিলেনা, তখন আমি নিজে গিয়ে জোর ক’রে পায়ের ধুলো নিয়ে আসবো।

পার্কীর মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সপত্নীকে দেখিবার জন্ত রমার এত আগ্রহ কেন ? কি রকম মেয়ে সে ? সপত্নীবিদ্বেষ কি তাহার মনে স্থান পায় না ? একটু ভাবিয়া পার্কী জিজ্ঞাসা করিল, “হারে বাঁশী, তোর রমা-দিদি কেমন রে ?”

বাঁশী বলিল, “কেমন আবার, এই যেমন পাঁচটা মেয়ে, তেমনি।”

পার্কী। আমার মতন, না আমার চেয়ে দেখতে ভাল ?

বাঁশী। আরে না না, দেখতে মোটেই ভাল নয়। বোসেদের ছোট বোকে দেখেছ ?

আমীর খর

পার্কী। ঐ রকম কালো ?

বাণী। হ্যাঁ, পায়ের রং ঐ রকম। তবে অমন মোটা মোটা নদ্র, রোগা ছিপ্ ছিপে চেহারা, মুখটা একটু লম্বা, কপালটা উচু। দেখতে মোটেই ভাল নয় দিদি, তবে তার মনটি খুব ভাল।

বিজ্ঞপের স্বরে পার্কীতী বলিল, “ওঃ, এই তোঁর কাল-পেঙ্গী রমা-দিদি, তারই এত সুখ্যাতি ! আমি ভেবেছিলাম, না জানি কি চমৎকার যেয়ে সে !”

গম্ভীরমুখে বাণী বলিল, “দেখতে চমৎকার না হোক, বলেছি তো তার মনটি কিন্তু চমৎকার। তুমি যদি একবার তার সঙ্গে কথাবার্তা কও, তাহ’লে তাকে কখনো ভুলতে পারবে না।”

পার্কীতী হাসিয়া বলিল, “এমনই যদি তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েও কাজ নেই, সে ভাল আছে, ভালই থাক, আমি মন্দ—মন্দই থাকি। শেষে তার ভাবনা ভাবতে ভাবতে কি পাগল হয়ে যাব !”

পাগল হইবার আশঙ্কা থাকিলেও পার্কীতী রমার কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সাংসারিক কার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও রমাব অস্বাভাবিক সপত্নীপ্ৰীতিটা তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে যেন নিত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। পার্কীতী জোর করিয়া সে চিন্তাটাকে মন হইতে দূর কবিতো চেষ্টিত হইল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, সে চেষ্টার ফলেই যেন সপত্নী-চিন্তাটা তাহার মনের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া যাইতে থাকিল। ইহাতে পার্কীতী যেন নিত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িল।

উত্ত্যক্ত হইলেও পার্কীতী কিন্তু এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না। রাত্রিতে কাজকর্ম শেষ করিয়া সে যখন নিশ্চিন্তভাবে

স্বামীর ঘর

শস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন রমার কথা আসিয়া তাহার নিশ্চিন্ত চিন্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। আচ্ছা, কি রকম মেয়ে সে! হাজার হউক পার্করতী তাহার সপত্নী—স্বামী-প্রেমের অংশীদার। ভাগ্যবলে অংশীদার নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দিয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ স্বত্ব উপভোগের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সৌভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের কাল-মেঘ ডাকিয়া আনিতে চাহে কেন? সপত্নীকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া স্বামী-প্রেমের অংশ দিতে এত উৎসুক কেন? এত সরল—এতটা উদার প্রাণ তাহার? সপত্নী-বিদ্বেষ কি তাহার মনে একটুও স্থান পায় না? কি রকম মেয়েমানুষ সে? তাহার প্রাণটা কোন্ ধাতু দিয়া গড়া? পার্করতী তো কৈ মনের ভিতর এতটা সবলতা—এতটা উদারতা আনিতে পারে নাই, স্বামী-প্রেমের অংশভাগিনী সপত্নীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে সমর্থ হয় নাই? বরং সে সপত্নীর উপর সম্পূর্ণ বিদ্বেষই পোষণ করিয়া আসিতেছে। সতীন-- বাহার নামে গায়ে কাঁটা দেয়, তাহাকে ভালবাসিবে, আদর করিয়া স্বামী-প্রেমের অংশ দিবে, এতটা মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে সে কখনও পারিবে কিনা সন্দেহ। তবে সেই কালো কুংসিত মেয়েটা এতটা উচ্চ, এত মহৎ, আর তাহার কাছে পার্করতী এত ক্ষুদ্র, এত নীচ? ছি ছি, কি বিবদ লজ্জার কথা!

তা নয়, সে মেয়েটা দেখিতে যেমন, তাহার বুদ্ধিটাও সেই রকমই। নির্কোথ—নিতান্ত নির্কোথ সে। সতীন যে কি জিনিষ, তাহা সে জানে না, তাহার মোটা বুদ্ধিতে আসেই না। চিরদিন সে অশুভ স্বামী-প্রেম ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে প্রেমের অংশ ছাড়িয়া দেওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সে বুদ্ধিতে পারে না। এই জন্যই সে

আমীর ঘর

পার্কীকে লইয়া যাইতে এত সমুৎসুক । মনে করিয়াছে, সপত্নী একটা আমোদজনক বস্তু । কিন্তু হৃন্দরদর্শন কাল-ফণিনীর ত্রায় সেই সপত্নী যখন তীব্র হলাহল উদ্বীর্ণ করিবে, তখন সেই নির্বোধ মেয়েটা সপত্নী কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে, আর নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া হাঘ হাঘ করিয়া মরিবে ।

রমাকে নির্বোধ ও আপনাকে বুদ্ধিমতী স্থির করিয়া লইয়া পার্কী নিজের মনকে সাস্তনা দিল যে, রমা তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই উচ্চ নহে, রমার এই যে সরলতা বা উদারতা, ইহা নির্বুদ্ধিতা নাত্র, বুদ্ধি থাকিলে জানিয়া শুনিয়া সে কখনই আগুনের ভিতর পা বাড়াইয়া দিত না । অগ্নির দাহিকাশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির আগুনে হাত বাড়াইয়া দেওয়াকে সাহস বলা যায় না, নির্বুদ্ধিতাই বলা যায় ।

এইরূপে রমাকে নিজের অপেক্ষা হীন ভাবিয়া লইয়া পার্কী মনকে সাস্তনা দিল, এবং এই সাস্তনার কলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলে সে ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইয়া পড়িল ।

নিদ্রাবস্থায় পার্কী স্বপ্ন দেখিল, যেন হঠাৎ একদিন খোকাকে লইয়া রমা সেখানে উপস্থিত হইয়াছে এবং পার্কীর সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, “আমি এসেছি দিদি ।”

পার্কী বানীর বর্ণিত চেহারা দেখিয়া চিনিতে পারিল, এই সেই রমা । রমার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে পার্কী এত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, কি বলিবে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল । তাহার এই হতবুদ্ধিতা দর্শনে রমা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমাকে

আমীর ঘর

চিন্তে পাচ্ছে না দিদি, আমি তোমার সতীন যে। দাদা কোথায় গেল ? সে আমাকে চেনে, আমি তো ব'লেই দিয়েছিলাম, তুমি যখন সেখানে গেলে না, তখন আমি নিজেই তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব। তাই আমি খোকাকে নিয়ে নিজে এসেছি। এখন তোমার পায়ের ধুলো একটু দাও তো, পোকাকার মাথায়, নিজের মাথায় দিই !”

পার্কীতী সবিস্ময়ে রমার সরল সহাস্ত পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি, কালো মুখে এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য, এত প্রফুল্লতা ! আর পার্কীতীর নিজের মুখ ? তাহা যে বিদ্রোহের কালিমার মলিন, অন্তর ঈর্ষার পুতিগন্ধে অপবিত্র ! সে কি এই সরলা হাস্যময়ী ঈর্ষাধ্বেন-বিরহিতা সপত্নীকে পায়ের ধূলা দিবার উপযুক্ত ? না রমা, না রমা, আমিই তোমার পদধূলি গ্রহণের যোগ্য।

রমা হস্ত প্রসাবিত কবিতা পায়ের ধূলা লইতে গেলে পার্কীতী সসঙ্কোচে সরিয়া গেল। রমা হাসিয়া বলিল, “স’রে গেলে যে দিদি ? সতীন ব’লে বুঝি আমাকে পায়ের ধূলাও দেবে না ? তা হবেনা কিন্তু। আমি তোমার পায়ের ধুলো না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বো না।”

রমা পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিল, পার্কীতীও পশ্চাতে কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইল। রমা কিন্তু ছাড়িল না। সে পায়ের ধূলা লইবার জন্ত হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল। পার্কীতীও যেন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল, এবং রমার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত এবার ছুটিল। রমাও বাম ক্রোড়ে খোকাকে চাপিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিল। পার্কীতী ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় পড়িল, তবু যে নিষ্ফল নাই, রমা খোকাকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। রক্ষা কর রমা, রক্ষা কর।

আমীর ঘর

আমি তোকে পায়ের ধুলো দিতে পারবো না। পার্বতী উৰ্দ্ধ্বাসে ছুটিল। কণ্টকাঘাতে পদতল কত-বিক্ষত হইল, হোঁচট লাগিয়া পায়ের আঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল, কতস্থান দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল, দরদর ধারায় ঘর্ষধারা প্রবাহিত হইয়া পবিধেষ সিক্ত করিয়া দিল। তথাপি বিরাম নাই, ঘর্ষাক্ত দেহে শোণিতাক্ত পদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পার্বতী ছুটিল; ছুটিতে ছুটিতে কত লোকালয়, কত মাঠ-ঘাট, কত খাল-বিল অতিক্রম করিল, তথাপি পার্বতী থামিল না, রমাও তাহার অহুসরণে বিরত হইল না।

ও কি, কানাচাঁদ এখানে আসিল কোথা হইতে? কানাচাঁদ উচ্চকণ্ঠে পার্বতীকে ডাকিয়া বলিল, “থাম পার্বতি, থাম।”

ওগো, পার্বতী যে আর ছুটিতে পারে না। তুমি রমাকে নিবৃত্ত হইতে বল, পার্বতী থামিতে পারিবে না। ঐ যে রমা তার পায়ের ধূলা লইবার জন্ত ছুটিয়া আসিতেছে। পার্বতী ছুটিতে ছুটিতেই একবার পশ্চাতে ফিরিয়া রমার দিকে চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা বিবম হোঁচট খাইয়া ঠিক কানাচাঁদেব পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাচাঁদ কোতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রমাও আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া গেল, এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “এবার তো ধরেছি দিদি, আব কোথায় পালাবে?”

পার্বতী ব্যাকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “ছেড়ে দে সর্বনাশী, ছেড়ে দে, আমি তোকে পায়ের ধুলো দিতে পারবো না।”

কিন্তু তাহার বাক্যক্ষুরণ হইল না, কণ্ঠ হইতে শুধু একটা অশ্রুট

আমীর ঘর

গৌ গৌ শব্দ বাহির হইল মাত্র । সে শব্দ শুনিয়া শুধু কানাটাদ বা রমানয়, সমগ্র চরাচর বিকট ধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল ।

পার্কতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । কোথায় রমা ! কোথায় কানাটাদ ! পার্কতী নিজের ঘরে নিজের শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে, প্রভাতেব আলো নুগ্ন গবাক্ষপথে আসিয়া তাহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে । পার্কতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘর্মাক্ত দেহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল । কিন্তু প্রভাতবায়ু ধীবে ধীবে আসিয়া তাহার ললাটস্থিত শ্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিতে লাগিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পার্কতী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, “রোদ আসিয়া ঘরের চালে পড়িয়াছে । লক্ষ্মী তখনও উঠে নাই, বাশী বাড়ীর বাহিরে একটা লাঠী লইয়া তাহার চালনা শিক্ষা করিতেছে । পার্কতী উঠানে গোবরজল দিয়া রাত্রের এঁটো বাসন ঘাটে ফেলিয়া আসিল এবং তখনও লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙে নাই দেখিয়া তাহাকে ডাক দিল । কিন্তু দুই তিন ডাকেও সাড়া শব্দ না পাইয়া ঘরের দরজার কাছে গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “বৌ, আজ কি তোর ঘুম ভাঙবে না ?”

সে খুব ভারী গলায় উত্তর করিল, “না ।”

আশ্চর্যান্বিতভাবে পার্কতী বলিল, “না কি লো, কত বেলা হয়েছে দেখ্ দেখি । এত বেলা পর্যন্ত তো কোন দিন পড়ে থাকিস্ না !”

স্বামীর ঘর

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না, কিন্তু যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ পার্শ্ব-
তীর কানে আসিল। সে সাতিশয় বিম্বিত হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, “তুই কাঁদচিস্ নাকি বৌ? ও মা, সত্যিই তো
কাঁদচিস্। কেন, কি হয়েছে?”

লক্ষ্মী নিরুত্তর। সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া আরও একটু জোবে
ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “নাঃ, বৈশো
আমাকে জ্বালিয়ে তুললে। তোকে বকেছে বুঝি? কেন, কি করে-
ছিলি তুই?”

লক্ষ্মীর ক্রন্দনের বেগটা ক্রমেই যেন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পার্শ্বতী
তখন তাহাকে সাঙ্গনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, “আচ্ছা, বৈশোর সঙ্গে
আজ আমার বোঝা-পড়া হবে। এখন উঠে আয় তুই।”

বলিয়া সে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তুলিতে গেল। কিন্তু তার হাত
ধরিতেই প্রকোষ্ঠ বলয়শূন্য দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,
“ও মা, তোর হাতের বালা গেল কোথায়? কানের মাঝডী, গলার
হার, পায়ের মল কিছুই নাই যে। গায়ের গয়না সব খুলে ফেলেছিস্
কেন?”

চাপা কান্নায় ফুলিতে ফুলিতে লক্ষ্মী রোদনকন্ড কর্তে বলিল, “সব
কেড়ে নিয়েছে।”

বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “কেড়ে নিয়েছে।
কে কেড়ে নিলে? বালাী? গয়না কেড়ে নিলে কেন?”

কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, “বাঁধা দেবে।”

পার্শ্বতী এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, “বাঁধা দেবে? তুই দেখছি
নেহাং পাগল!”

স্বামীর ঘর

লক্ষ্মী এবার রোদন-স্বীত মুখখানা উপাধান হইতে উত্তোলিত করিয়া উত্তর দিল, “আমি পাগল নই ঠাকুরঝি, সত্যিই বাঁধা দেবে।”

সহাস্ত্রে পার্শ্বতী দ্বিজ্ঞাসা করিল, “বাঁধা দিগ্বে কি করবে শুনি, মদ-ভাং থাকে ? না বাবুয়ানা করবে ?”

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিল, এবং আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, “মদও থাকে না, বাবুয়ানাও করবে না, ব্যবসা করবে।”

পার্শ্ব। ব্যবসা ! কি ব্যবসা করবে ?

লক্ষ্মী। তেঁতুলেব ব্যবসা। বেণী মাষ্টারের সঙ্গে তেঁতুলের ব্যবসা করবে।

পার্শ্ব। কে বললে তোকে ?

লক্ষ্মী। যে ব্যবসা করবো, সে।

পার্শ্ব। কৈ, আমাকে তো কিছু বলেনি !

লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। পার্শ্বতী বলিল, “আচ্ছা, বাঁশীকে ডেকে দ্বিজ্ঞাসা করি, সে কি ব্যবসা করবে।”

কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, “যে ব্যবসাই করুক, আমার গয়না যদি বাঁধা দেয়, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দোব, আফিং খেয়ে মরবো, তা বলে রাখছি।”

হাসিয়া পার্শ্বতী বলিল, “না না, এত কষ্ট কোরে তোকে মস্তে হবে না। ব্যবসাই যদি করে, তাতে তোর গয়নাই বাঁধা দিতে হবে কেন ? ভয় নাই তোর, এখন উঠে আয়।”

তাহার নিকট অভয় পাইয়া লক্ষ্মী উঠিয়া আসিল, এবং মুখে হাতে জল দিয়া গৃহকর্ণে ব্যাপ্ত হইল।

পার্শ্বতী ব্যাপার কি জানিবার জন্ত কৌতূহলান্বিত হইয়া বাঁশীকে

স্বামীর ঘর

ডাকিতে গেল। কিন্তু তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইল না। অগত্যা তাহাকে তখনকার জন্ত কোতুহল চাপিয়া রাখিতে হইল।

মধ্যাহ্নকালে বাঁশী খাইতে বসিলে পার্শ্বতী তাহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ রে বাঁশী, তুই ব্যবসা করবি নাকি শুন্ছি?”

বাঁশী বলিল, “হাঁ, তেঁতুলের ব্যবসা করবো।”

কোতুহলাঘিতভাবে পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “তেঁতুলের ব্যবসা আবার কি রে?”

বাঁশী বলিল, “এখান থেকে তেঁতুল কিনে কলকাতায় চালান দেব।”

পার্শ্বতী বলিল, “তাতে কি হবে?”

বাঁশী বলিল, “লাভ হবে, আর কি হবে?”

বাঁশী তখন ব্যবসা-সংক্রান্ত সকল কথা পার্শ্বতীকে বুঝাইয়া বলিল, পার্শ্বতী শুনিয়া চিন্তিতভাবে বলিল, “লাভ আছে বটে, কিন্তু এসব ব্যবসা বাণিজ্য করা কি তোমর কাজ! কত চালাক-চতুর হ’লে, কত খাটলে তবে ব্যবসা হয়।”

বাঁশী বলিল, “বেণী মাষ্টার কাজ কর্তব্য সব দেখবে। যে লাভ হবে, তার সিকি তাকে দিতে হবে।”

পার্ক। কিন্তু যদি লোকসান হয়?

বাঁশী। সে কপাল।

একটু ভাবিয়া পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “তা ব্যবসা করিস্ করবি কিন্তু বোয়ের গয়না সব নিয়েছিস্ কেন?”

বাঁশী। ব্যবসা করতে হ’লে টাকা চাই তো।

পার্ক। তাই বোয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় করবি বুঝি?

স্বামীর ঘর

বাণী । তা নয় তো টাকা কোথায় পাব ?

পার্কীতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, “তা ব্যবসা করবি ব’লে বোয়ের জিনিষ বাঁধা দিতে পাবিস, কিন্তু আমাকে একটা কথাও তো বলিস্ নাই !”

বাণী বলিল, “টাকা-কড়ির যোগাড় ক’রে তোমাকে বলবো মনে করেছিলাম ।”

পার্কীতী বলিল, “বোয়ের গয়না বাঁধা না দিয়ে আমার গয়না বাঁধা দিলেও তো টাকার যোগাড় হ’তে পারতো ?”

বাণী উত্তর করিল, “তা হ’তেও পারতো, কিন্তু কপালের জ্বেরে যদি ব্যবসায় লোকসান হয় ?”

পার্কী । তাহ’লে আমার গয়নাগুলো বিক্রিয়ে যাবে এই তো ভয়, না ?

বাণী । হ্যাঁ ।

পার্কী । কিন্তু বোয়ের গয়না কি বিক্রিয়ে যাবে না ?

বাণী । যায়, গেল ।

একটা অস্বাভাবিক গাঙ্গীর্ষ্যে পার্কীতীর মুখখানা যেন অদ্ভুতকার হইয়া আসিল । সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, “বাণী !”

বাণী । কি ?

পার্কী । আমি তোর কে ?

বাণী । দিদি ।

পার্কী । আপনার দিদি নয়, জাইতুতো বোন, না ?

বাণী । কি জানি ।

স্বামীর ঘর

পরশ্বকণ্ঠে তর্জ্জন করিয়া পার্বতী বলিল, “কি জানি কেন, আমি যে জাটুতুতো বোন,—পর, একথা তুই ভাল রকমেই জানিস্, না জান্লে আমাকে কোন কথা না ব’লে বোয়ের গয়না নিতে যাবি কেন ?”

বাঁশী চূপ করিয়া রহিল। পার্বতী অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা বাঁশী, আমি কি তোকে কোনদিন পর ব’লে ভেবেছি ?”

বাঁশী মুখ তুলিয়া একটু রুদ্ধস্বরেই উত্তর করিল, “ভেবেছ বৈ কি ।”

অভিমানের উচ্ছ্বাসে পার্বতীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ভারী গলায় বলিল, “তোকে পর ভেবেছি, এ কথা তুই বল্লি বাঁশী ?”

বাঁশী বলিল, “সত্যি কথা বলবো, তার আর ভয় কি ?”

রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পার্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে তুই আমাকে পর ভাবতে দেখলি ?”

বাঁশী আহার শেষ করিয়া झল খাইতেছিল। জলের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, “অনেক রকমেই দেখেছি। তার মধ্যে দেখছি এই বোঁকে নিয়ে। কথা বাড়িয়ে তুল’ না দিদি, বাঁশী হক্ কথা বলতে একটুও ভয় করে না, জান তো ?”

বাঁশী উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতে চলিয়া গেল; পার্বতী শুক নিষ্পন্দ হৃদয়ে কাঠের পুতুলের মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বাঁশীকে সে পর ভাবে ? হা ভগবান্, বাঁশী তাহার পর ! এই পরের জন্য সে নিজের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, স্বামীর ঘর ছাড়িয়াছে, মেয়েমানুষে যাহা পারে না—স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে সপত্নীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তবু বাঁশীকে সে পর ভাবে ? মধ্যাহ্নের প্রখর আলোটা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন নির্কাপিত হইয়া আসিল, সমগ্র সংসারটা

আমীর ঘর

ভীমবেগে তাহার চারিদিকে ঘূর্ণিত হইতে থাকিল, বুকের হাড়গুলা হইতে মাথার শিরা-উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত যেন ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল। পার্শ্বতী অসাড় নিশ্পন্দভাবে রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

খানিকপরে লক্ষ্মী আসিয়া ডাকিল, “ঠাকুর-ঝি !”

পার্কতীব বুঝি তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তন্ময়চিত্তে কঠোর প্রত্যা-
খ্যানস্কন্ধ কালাচাঁদেব মলিন মুগধানা কল্পনার চক্ষে সন্দর্শন করিতেছিল।
সুতরাং লক্ষ্মীর আহ্বান তাহার কাণে গেল না। সাভ না পাইয়া লক্ষ্মী
তাহার কাছে গিয়া গা ঠেলিয়া ডাকিল, “ঠাকুর-ঝি, ও ঠাকুরঝি !”

চমকিয়া উঠিয়া পার্কতী উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে ফিরিয়া
চাহিল, লক্ষ্মী বলিল, “অমন ক’বে দাঁড়িয়ে কেন ঠাকুর-ঝি ? আজ
কি খেতে হবে না ?”

পার্কতী যেন পুনরায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ব্যস্তভাবে খুঁটি
ছাড়িয়া ভাত বাড়িতে গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

তা বাঁশী যে বাস্তবিকই দিদিকে পর ভাবিয়া লইয়াছিল এবং
তজ্জগুই দিদিকে কোন কথা না বলিয়া বা দিদির গহনা না লইয়া লক্ষ্মীর
গহনা লইতে গিয়াছিল, তাহা নহে। এতটা অকৃতজ্ঞ সে হইতে পারে
নাই। সংসারে যদি সে কাহাকেও আপন বলিয়া ভাবিতে পারে, তবে

আমীর ঘর

সে দিদি ; এমন স্নেহময়ী দিদি বাহার নাই, সে যে কেমন করিয়া এই সংসারে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই ভাবিয়া বাঁশী অনেক সময়ে আশ্চর্যান্বিত হইত ।

তথাপি সে যে দিদির মুখের উপর এমন কড়া কথাগুলি বলিয়া ফেলিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের কথা নয়, কতকটা দুঃখে, কতকটা অভিমানেই এমন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল । লক্ষ্মী যে ইদানীং পার্শ্বতীকে আদৌ গ্রাহ্য করিত না, এবং সময়ে সময়ে বেশ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিত, তাহা বাঁশীর অগোচর ছিল না । যখন জানিতে পারিত, তখন ক্রোধে বাঁশীর মর্শ্বস্থল পর্য্যন্ত যেন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিত, এবং সে আগুনে লক্ষ্মীকে পোড়াইয়া ফেলিবার জন্ত সে সমুদ্রত হইয়া পড়িত । কিন্তু পার্শ্বতী যখন বাঁশীর নিকট নিজের এই লাঞ্জনাকে গোপন করিয়া লক্ষ্মীকে আশুলিয়া দাঁড়াইত, তখন বাঁশীর এই ক্রোধটা গভীর দুঃখে ও অভিমানের আকারে পরিণত হইয়া তাহাকে যেন অধীর করিয়া তুলিত । দিদির এ কিরূপ অবিচার । এই তুচ্ছ বোটা হইল তাহার আপন, আর বাঁশী হইল পর, লক্ষ্মীর লাঞ্জনা সে নীরবে সহ্য করিবে, আর সেই লাঞ্জনাজনিত দুঃখ বাঁশীর কাছে গোপন করিয়া যাইবে । বাঁশী কি এতই পর যে, তাহার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে দিদির এত সঙ্কোচ ! পার্শ্বতীর উপর অভিমানে বাঁশীর বুকটা ক্রোধে দুঃখে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ।

তা শুধু এই কারণেই যে বাঁশী দিদিকে কিছু না বলিয়া স্ত্রীর গহনা লইয়াছিল, তাহা নহে, ইহার অল্প কারণও ছিল । বাঁশী যে কোন কাজকর্ম করেনা, শুধু বসিয়া বসিয়া থাইয়া মাটি হইয়া যাইতেছে,

আমীর ঘর

পার্কভী সময় সময় রাগের মাধ্যম ছুঃখ সহকারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিত। তাহার এই আক্ষেপপূর্ণ মন্তব্য যেন তীব্র তিরস্কারের আকারে বাঁশী গ্রহণ করিয়া লইত। তারপর লক্ষ্মীও প্রবীণা গৃহিণীর মত বাঁশীকে অর্থোপার্জন করিয়া মাহুস হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকিত, এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িত না। তাহার এই বাক্যবাণে বাঁশী ক্রমেই যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, দিদির কাছে ইহার কোন প্রতীকারের আশা নাই, ইহা সে বেশ জানিত। কাজেই যে কোন একটা কাজে লাগিয়া লক্ষ্মীর বাক্যবাণের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বেণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরিশেষে সহজসাধ্য তেঁতুলের ব্যবসা স্থির করিয়া ফেলিল। ব্যবসায়ে টাকা চাই। দিদিকে বলিলে দিদি যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দিতে পারে। হাতে টাকা না থাকিলে দিদি অন্ততঃ নিজের গয়নাগাঁটা বাঁধা দিয়াও টাকার উপায় করিবে। কিন্তু সে উপায় বাঁশীর মনঃপুত হইল না। এই টাকা সংগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্মীকে একটু জ্বল করিবার ইচ্ছাও বাঁশীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পার্কভীর অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্মীর গহনা বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহে অভিলাষী হইল। দিদি জানিলে তো লক্ষ্মীর গহনায় হাত দিতে দিবে না !

এইরূপ ভাবিয়াই বাঁশী পার্কভীকে না জানাইয়াই লক্ষ্মীর গহনাগুলো হস্তগত করিল। অবশ্য সহজে সে হস্তগত করিতে পারিল না ; গহনা দিতে লক্ষ্মী অনেক আপত্তি করিল ; প্রথমে তর্জন-গর্জন, শেষে কাঁদাকাঁটা পর্য্যন্ত করিল। কিন্তু বাঁশী তাহার কোন আপত্তিই শুনিল না, জোর করিয়া তাহার গা হইতে গহনা খুলিয়া লইল।

আমীর ঘর

গহনাগুলা বাঁধা পড়িবার আগেই পার্শ্বতী তাহা জানিতে পারিল বটে, কিন্তু বাঁশীও কথায় সে এমন আঘাত পাইল যে, সেই আঘাত সামুলাইয়া লইয়া বাঁশীর সঙ্কল্পে বাঁধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে তাহার অনেকটা সময় লাগিল। পরদিন পার্শ্বতী আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাঁশীর কাছে যখন গহনা ফিরিয়া চাহিল, তখন বাঁশী গহনা বাঁধা দিয়া ফেলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা বেণী মাষ্টারের হাতে দিয়া আসিয়াছে, শুনিয়া পার্শ্বতী রাগিয়া উঠিল, এবং রাগে বাঁশীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু তিরস্কার করিয়াও গহনা ফিরিয়া পাইল না।

গহনা বাঁধা পড়িয়াছে শুনিয়া লক্ষ্মী কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কুটিয়া বাড়ী যেন মাথায় করিল। বাঁশী কিন্তু তাহার কান্নাকাটিতে জ্বরেপ করিল না, বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। পার্শ্বতী বোকে সাধনা দিতে গিয়া তাহার নিকট কতকগুলো রুট কথা শুনিয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া আসিল। সে নিজের গহনা লক্ষ্মীকে দিতে গেল, লক্ষ্মী তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অগত্যা পার্শ্বতীকে নিরস্ত হইতে হইল।

কাঁদাকাটায় আপাততঃ গহনা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই দেখিয়া ছুই চারিদিন কাঁদিয়া কাটিয়া পরিশেষে লক্ষ্মীকেও চুপ করিতে হইল। বাঁশী মহোৎসবে বেণী মাষ্টারের সহিত মিলিত হইয়া কারবার আরম্ভ করিল।

চারিদিক হইতে রাশি রাশি তেঁতুল আসিয়া পড়িল, তাহা বস্তাবন্দী হইল, তারপর গো-খান ও বাস-খানের সাহায্যে সেই সকল বস্তা কলিকাতায় নীত হইয়া বিক্রী হইতে থাকিল। টাকার স্মিট্ বন্ বন্ শব্দে বাঁশীর চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আমীর খর

কিন্তু তাহার এ আনন্দ স্থায়ী হইল না, মাস-চারেক পরেই দেখিল, ঝন্ ঝন্ শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। পরিশেষে হঠাৎ একদিন বেণী আসিয়া বলিল, “আরও কিছু টাকা চাই হে বংশীবদন।”

গম্ভীরভাবে বাঁশী বলিল, “সর্বনাশ! আর টাকা কোথায় পাব মাষ্টার?”

গম্ভীরভাবে বেণী বলিল, “টাকা কোথায় পাব বললে কি কারবার চলে? যে উপায়ে হোক, টাকার যোগাড় কত্তে হবে।”

বাঁশী একটু রাগতভাবে বলিল, “কি উপায়ে টাকার যোগাড় করব? চুবি ভাকাতি কত্তে যাব না কি? কেন, যে চারশো টাকা দিয়েছিলাম, সে টাকা কোথায় গেল?”

বেণী বলিল, “কোথায় গেল, তার হিসাব নাও না; খাতা দেখতে পার।”

বাঁশী বলিল, “খাতা পরে দেখবো, এখন মোটামুটি হিসাবটা নাও দেখি।”

বেণী বলিল, “চারশো টাকার মধ্যে একশো টাকা তো মুটে ভাড়া—বস্তা খরিদ—গাড়ীভাড়া—হোটেল-খরচ ইত্যাদি খরচেই গিয়াছে। বিলেত পড়েছে দু’শো টাকা, একশো টাকা ব্যাপারীদের দাদন দেওয়া আছে।”

বিস্ময়াবিষ্টভাবে বেণীর মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশী বলিল, “দু’শো টাকা বিলেত! এত টাকা বিলেত ফেললে কেন?”

বেণী বলিল, “বিলেত না ফেললে কি ব্যবসা চলে?”

বাঁশী। কিন্তু এবার ব্যবসা চলবে কি করে?

বেণী। আর কিছু টাকা দিলেই চলতে পারে।

স্বামীর ঘর

বাণী । আর কিছুটা কত শুনি ।

বেণী । অন্ততঃ শ'তিনেক । বিলেত যেটা পড়েছে, ঐটাই প'ড়ে থাকবে, দাদনও আর দিতে হবে না । এখন ঐ তিনশো টাকা মাল কেনা-বেচা চলবে ।

বাণী । কিন্তু আমি আর তিন টাকাও দিতে পারবো না ।

বেণী । টাকা দিতে না পার, যা দিয়েছ, সে সব জলে যাবে । কারবার তুলে নিলে বিলেত এক পয়সাও আদায় হবে না, দাদন ফিরে পাওয়া যাবে না ।

বাণী । কিন্তু আগে তো তুমি বলেছিলে, শ'তিনেক টাকা হ'লেই ব্যবসা চলবে । তার যায়গায় আমি চারশো দিয়েছি ।

রাগতভাবে বেণী বলিল, “যা দিয়েছ, তার হিসাব নিতে পার । তোমার টাকা আমি খেয়ে ফেলি নাই ।”

বাণী বলিল, “তুমি খেয়ে ফেলেছ, এমন কথা আমি বলছি না মাষ্টার, কিন্তু আমার তো আর টাকা দেবার উপায় নাই ।”

তাহাকে হতাশ দেখিয়া বেণী বুঝাইয়া বলিল, “একেবারে হাল ছেড়ে দিও না বংশীবদন, দিদিকে ধরে টাকার যোগাড় কর । এবার তুমি তিনশো টাকা দিয়ে দেখ, কি চালানে তোমাকে একশো লাভ দেখিয়ে দিতে পারি কি না ।”

অগত্যা বাণী গিয়া পার্শ্বতীকে সকল কথা বলিল , শুনিয়া পার্শ্বতী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, “আমি তো তখন বলেছিলাম বাণী, তোর দ্বারায় ব্যবসা হবে না । আমার কথা না শুনে থাম্কা হাজার টাকার জিনিস নষ্ট ক'রে ফেলিলি ।”

দিদির তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইয়া বাণী সকাতরে বলিল, “আমি

আমীর খয়র

ঝকঝকি করেছি দিদি। এখন টাকাগুলোর যাতে কিনারা হয়, তাই কর।”

পার্বতী বলিল, “কিনারা আর কি, টাকা চাই তো? তা আমার গয়না বাঁধা দিয়ে তিনশো টাকা তোকে দিতে পারি, কিন্তু সে টাকাও যদি এই রকম যায়?”

বাঁশী বলিল, “না দিদি, বেণী মাষ্টার বলেছে, এবার তিনশো টাকা দিলে সে ফি-চালানে আমাকে একশো টাকা লাভ দেবে।”

পার্বতী বলিল, “যেমন চারশো টাকায় তোকে চারশুণ লাভ দিয়েছে, সেই রকম তো? তোর বেণী মাষ্টারকে আমার বিশ্বাস নাই।”

দিদির এই অবিশ্বাস দূর করিবার জন্ত বাঁশী ঘাড় নামিয়ে বলিল, “না দিদি, বেণী মাষ্টার অবিশ্বাসী নয়। এত টাকা যে বিলেত পড়বে, তা ও বেচারীও জানে না।”

পার্বতী বলিল, “এমন বেচাবীর ওপর ভার দিয়ে কারবার চালান যায় না। তার চাইতে তুই এক কাজ কর, তোর সরকার মশায়ের কাছে যা।”

বাঁশী ঈর্ষ শঙ্কিতভাবে বলিল, “সরকার মশায়ের কাছে গেলে কি হবে?”

পার্বতী বলিল, “তোর চেয়ে, তোর বেণী মাষ্টারের চেয়ে ব্যবসার কাজ ঢের ভাল বোঝে। তাকে সব কথা খুলে বল। তারপর সে যেমন বলবে, সেই রকম করবি।”

বাঁশী: সরকার মশাই যদি টাকা দিতে বলে?

পার্বী: টাকা দেব।

আমীর ঘর

বাণী । দেবে ?

পার্কী । নিশ্চয় দেব ।

বাণী তখন আশাব্যস্ত হইয়া কানার্টাদের কাছে গিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল । কানার্টাদ শুনিয়া চিন্তিত হইল এবং বাণীর সহিত আসিয়া বেণীর নিকট হইতে খাতাপত্র আনাইয়া তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল । তারপর খাতা লইয়া কলিকাতায় গেল এবং দিন-দুই পবে ফিরিয়া আসিয়া বাণী ও পার্কী উভয়কেই জানাইল যে, খাতাপত্র সব বাজে, খাতায় যে-সব দোকানদারের নাম আছে, অনেক অনুসন্ধানে ও সেই সকল দোকানদার বা দোকানের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না । ...নং হাটখোলায় গোবর্দ্ধন বাগ বলিয়া কোন দোকানদার নাই, গিরিশ নাগ নামে এক দোকানদার আছে, কিন্তু তাহার সন্দেশের দোকান, স্ততরাং তাহার তেঁতুল কিনিবার কোনই সম্ভাবনা নাই । নূতন বাজারে হারাদন দে নামে কোনও তেঁতুল বিক্রেতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না । শেঁতাবাজারেও তাই । ... নং মানিকতলায় উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক দোকানদার আছে বটে, কিন্তু তাহার মণিহারীর দোকান, তেঁতুল খরিদারের কথা শুনিয়া সে কানার্টাদকে পাগল করিয়া এমন ঠাট্টা-বিক্রপ আরম্ভ করিল যে, কানার্টাদ পলাইয়া আসিয়া পথ পায় নাই । অতএব খাতাপত্র মিথ্যা, দোকানদারের নাম সম্পূর্ণ কল্পিত, বিলেতের টাকা সমস্তই বেণী আত্মসাৎ করিয়াছে । শুধু বিলেতের টাকা কেন, বিশ পঁচিশ টাকা বাজে খরচ ছাড়া বাকী সকল টাকাই বেণী হস্তগত করিয়া বাণীকে ফাঁকী দিয়াছে ।

শুনিয়া বাণী রাগে অলিয়া উঠিল এবং বেণীকে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকূল দিবার অভিপ্রায়ে একগাছা লাঠী লইয়া ধাবমান হইল ।

স্বামীর ঘর

কালচাঁদ বহুকষ্টে তাহাকে কিরাইরা প্রবোধ দিয়া বলিল, “দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক’রে কোন ফল নাই বাঁশী, তার চেয়ে পার যদি, তার নামে প্রতারণার নালিশ কত্রে পার।”

কিন্তু নালিশ-দরবার করিতে হইলে টাকার দরকার, হাঙ্গামাও অনেক। পার্করতী বলিল, “নালিশ-দরবার করলেও যখন তার গ্রাস থেকে টাকা কিবে পাবার উপায় নাই, তখন শুধু তাকে জেল খাটাবার জন্তে আরও কতকগুলো টাকা খরচ করা মিছে। তার চাইতে জিনিষগুলো যাতে উদ্ধার হয়, তাই করা দরকার।”

কালচাঁদও এই যুক্তিতে সায় দিল এবং সেইরূপই কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ হইল বটে, কিন্তু তদন্তকারী কার্য্য করা সহজ সাধ্য হইল না। চারিশত টাকার যোগার করিয়া গহনা উদ্ধার করিবার কোন উপায়ই দেখা গেল না। এক উপায় জমি বিক্রয়। কিন্তু জমি বেচিয়া গহনা উদ্ধার করিতে বাঁশী রাজী হইল না। বলিল, “পেট আগে, গহনা পরে। জমি বেচলে সারা বছর খাব কি?” লক্ষ্মী কিন্তু এত ভাবিয়া দেখিল না, সে গহনার শোকে অবীর হইয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার এই কান্নাকাটিতে আলাতন হইয়া পার্করতী ভাইকে বলিল, “এক

আমীর ঘর

কাজ করু বাঁশী, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে বোয়ের গয়না ছাড়িয়ে নিয়ে আয়।”

বাঁশী বলিল, “বোয়ের গয়নাই গয়না, আর তোমার গয়না কি গয়না নয়?”

পার্কতী বলিল, “তা হোক, আমার গয়না গেলে আমি এত কাঁদবো না।”

বাঁশী বলিল, “তুমি না কাঁদলেও আমার বোকামির প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে কত্তে দেব না।”

পার্কতী একটু রাগিয়া বলিল, “কেন রে বাঁশী, তুই কি আমার পর?”

ভারী মুখে বাঁশী উত্তর করিল, “পর না ভাবলে বোয়ের গয়নার বদলে তোনার গয়না নষ্ট করতে চাইবে কেন?”

এ উত্তরে পার্কতী পরাজিত হইয়া নিরস্ত হইল। সে লক্ষ্মীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আপাততঃ গহনার জন্ত দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। যদিই তাহার গহনাগুলো যায়, পার্কতীর তো তুই চারিখান গহনা আছে, সে গহনা ভবিষ্যতে তাহারই হইবে। সে ইচ্ছা করিলে এখন ঐ সকল গহনা নিজের কাছে রাখিতে বা ব্যবহার করিতে পারে। তারপর সুযোগমত লক্ষ্মীর অলঙ্কার উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইবে।

লক্ষ্মী কিন্তু এ সাঙ্ঘনায় প্রবোধ মানিল না। তাহার ধারণা, ভাই বোন পরামর্শ করিয়াই তাহার এই সর্বনাশ করিয়াছে। তারপর এখন তাকে নিজের গহনা দিয়া ছেলে ভুলানোর মত ভুলাইয়া রাখিতেছে। ছেলে ভুলানো বৈ কি; এ গহনায় তো লক্ষ্মীর কোন অধিকার নাই, যখন ইচ্ছা

স্বামীর ঘর

হইবে, তখনই পার্কতী ইহা কাড়িয়া লইবে। সুতরাং এক্ষণ পরের সোণা কাণে বুলাইয়া ফল কি ?

এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া লক্ষ্মী ননদীর অলঙ্কার লইল না ; অধিকন্তু সে মাঠে ঘাটে সকলের কাছে গহনার জ্ঞান দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করিল, কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, ইহাতে বাণীর কোনই দোষ নাই, পার্কতীই বৌটাকে জব্দ করিবার জ্ঞান বাণীকে যুক্তি দিয়া এই কাজ করিয়াছে। নতুবা বাণীর সাধ্য কি, দিদির অমতে বোয়ের গহনায় হাত দেয় ? পার্কতী কি সহজ মেয়ে। যে মেয়ে স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিতে পারে, তাহার অসাধ্য কাজ ভূ-ভারতে কিছুই নাই। কে জানে বৌটাকে সর্বস্বান্ত করা সম্বন্ধে তাহার আর কোন দুঃখভিসন্ধি আছে কিনা।

যাহারা পার্কতীর অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দেহান হইল, তাহাদের মধ্যে সুপ্রবীণা বামুনদিদি বহু গবেষণার পর স্থির করিয়া লইলেন, পার্কতীর অভিসন্ধি আর কিছুই নয়, বেণীকে কোশলে টাকাগুলা পাওয়াইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। ঐ যে বেণী দিদি-দিদি করিয়া উহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে, তাহা বাজে যাওয়া-আসা নয়। টাকার জ্ঞান বেণীর এতদিন বিবাহ হয় নাই, এইবার তাহার বিবাহ হইবে। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, বিবাহেও বোধ হয় আর বিলম্ব হইবে না। তবে বেণীর বিবাহের জ্ঞান পার্কতীর কেন এতটা কোশলজাল বিস্তার, তাহা বামুনদিদির মত সরলপ্রাণা নিম্পাপহৃদয়া রমণীর অগোচর ; একমাত্র সর্বাস্বার্থ্যামী ভগবানুই তাহা বলিতে পারেন।

কিন্তু অন্তর্ধ্যামীর মনের কথাটা অল্পমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে

আমীর খর

অনেকেরই বিলম্ব হইল না। বিশেষতঃ লক্ষ্মী আগেই তাহা বুঝিয়া লইল, এবং অন্তান্ত সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াও মুখে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া শঙ্কিতভাবে পরস্পর গা টেপাটেপি করিলেও লক্ষ্মী বেশ স্পষ্টভাবেই পার্শ্বতীর অসাক্ষাতে তাহার মুখাঙ্গির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

সংসারে লোকের কেহ শত্রু, কেহ মিত্র থাকে, শত্রু শত্রুতাসাধন করে, মিত্র মিত্রতার কাজ করিয়া যায়। কিন্তু এমনও লোক কতকগুলি আছে, যাহারা একাধাবে শত্রু ও মিত্র উভয়ই সাজিয়া পরোক্ষে শত্রুতা এবং প্রত্যক্ষে মিত্রতাসাধন করিয়া থাকে। বামুনদিদি অনেকটা এই প্রকৃতির ছিলেন। স্মৃতরাং তিনি অসাক্ষাতে পার্শ্বতীর দোষ কীর্ত্তন করিলেও সাক্ষাতে তাহার হিতৈষণা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। পার্শ্বতীর সহিত দেখা হইলে তিনি লক্ষ্মীর নিন্দা করিয়া বলিতেন, “হাঁ পার্শ্বতী, বোটা কেমন মেয়ে গা! গেরোয় ফেবে গয়নাওলো না হয় নিয়েছেই, তা পাঁচজনের কাছে পাঁচকথা ক’রে বেড়ালেই কি সেগুলো ফিরে আসবে? না পাঁচজনে তার গয়না ফিরিয়ে এনে দেবে?”

সহাস্ত্রে পার্শ্বতী উত্তর করিল, “বৌয়ের ঐ এক কেমন দোষ বামুন-দিদি, গয়না গয়না ক’রেই পাগল।”

নাসাগ্র কুঞ্চিত কবিতা বামুনদিদি বলিলেন, “আরে গয়না! গয়না কিসের তরে? সময় অসময়ের তরেই তো। সেবায় পূজোর সময় মেয়েটার তত্ত্ব কত্তে হবে। তা হাতে একটি পরসা নাই। তোর বামুনদাদা বলে, ‘গিন্নি, মল তো তুমি আর পরনা, তা মল চারগাছা দাও যদি, তাহ’লে বাঁধা দিয়ে মেয়ের তত্ত্ব করি।’ বোসেদের বাড়ীর পূজোর

আমীর খয়র

দক্ষিণে পেলোই ছাড়িয়ে দেব।’ তা আমি ঠাট্টা করে বললুম, ‘পূজোর পর ঠিক ছাড়িয়ে দেবে তো?’ উনি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কস্তে গেলেন। আমি বললুম, ‘ছি ছি, দিব্যি কস্তে হবে না তোমাকে।’ তখন মল চারগাছা বার ক’রে দিলুম। তা উনি ষা বলেছিলেন, তাই করলেন, পূজোর পরই ছাড়িয়ে এনে দিলেন।”

পার্কীতী বলিল, “তা বাঁধা পড়েছে, ছাড়াতে দশদিন দেবী হয়, আমি বলি, তাই আমার গয়না নে। তাও নেবে না, শুধু গয়না-গয়না ক’রে কাঁদাকাটা করবে।”

প্রশংসমান দৃষ্টিতে পার্কীতীর মুখের দিকে চাহিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “বলিস কি? তুই নিজের গহনা দিতে গেলি, তবু ওর মন ওঠেনা? খন্টি ননদ পেয়েছিল ষা হোক। হ’তো আমাদের ননদের মত ননদ, তা হ’লে বুঝতে পারতো, কত ধানে কত চাল। বাপু, ননদ নয়, যেন বাঘিনী, মুখের দিকে চাহিলেই গায়ের রক্ত শুকিয়ে যেতো। টু শব্দটি করিবার জো ছিল? এমন ননদ পেলো তো তার পায়ে ধুলো খেয়ে জল খেতুম। না ভাই, তোদের বোটা বড় নিমক-হারাম।”

সলজ্জভাবে পার্কীতী বলিল, “ছেলেমানুষ কি না, এখনও ছেলেমানুষী ষাঙ্গিনী।”

সবেগে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বামুনদিদি যেন রোষজ্বলকণ্ঠে বলিলেন, “রেখে দে তোর ছেলেমানুষ। যে রকম সব কথা কয়, তেমন কথা আমরা এখনও কইতে পারিনা। সে সব কথা শুনে তুই অবাক হয়ে যাবি, রাগে তোর হাড়মাংস শুক জলে উঠবে।”

সেরূপ ক্রোধোত্তেজক ভয়ানক কথা শুনিতে যেন অনিচ্ছুক

আমীর ঘর

হইয়া পার্শ্বতী বলিল, “তা বলুক গে দিদি, কে ওর কথায় কাঁপ দেয় ?”

অন্তরে যেন একটা গভীর আশঙ্কা চাপিয়া ভারী গলায় বামুনদিদি বলিলেন, “তুই কাণ দিলি না, আমিও যেন কাণ না দিলুম, কিন্তু সকলেই তো তোর আমার মত নয়। তারা পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, তিল পেলে তাকে তাল করে বসে। তাদের কাছে পাঁচবকম পাঁচটা কথা বলা, তোর নিন্দে করা, এগুলো ভাল কি ?”

সহাস্তে পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “আমার নিন্দেও করে নাকি ?”

বাগ্রস্বরে বামুনদিদি বলিলেন, “ওমা, নিন্দে করেনা ? বলে কি জানিস্ ? তোরা ভাই-বোনে যুক্তি করে ওকে সর্বস্বান্ত করেছিস।”

বিস্মিতভাবে পার্শ্বতী বলিল, “কও কথা, আমি আবার যুক্তি কবলাম কিসে ? আমি বরং গয়নার তরে বাঁশীর সঙ্গে কম ঝগড়া করেছি !”

বামুনদিদি বলিলেন, “কিন্তু ও তা বলেনা। ও এখন বলে বেড়াচ্ছে, বেগী মাষ্টারের হাতে টাকাগুলো তুলে দেবার মূল তুই। তুই-ই কিকির খাটিয়ে, বাঁশীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব্যবসার অছিলায় বেগীকে টাকাগুলো পাইয়ে দিয়েছিস।”

গভীর বিশ্বয়ে চমকিয়া উঠিয়া পার্শ্বতী আরক্তমুখে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি বেগীকে টাকাগুলো পাইয়ে দিয়েছি ? কেন, বেগী আমার কে ?”

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বামুনদিদি স্বগার সহিত বলিলেন, “কে তা তোদের ঐ বোঁটাই জানে। আর জানে ওর পাপ মন !”

স্বামীর ঘর

পার্কস্‌তীর বুকটা যেন কি এক অস্বাভাবিক স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে বিশ্বয়ন্তক দৃষ্টিটা বামুনদিদির ঘৃণাকৃত মুখের উপর স্থাপন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বামুনদিদি তখন গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “তুই আমিই যেন ওব কথায় কাণ দিলুম না। কিন্তু এই সব কথা শুনে অপর পাঁচজনে কি মনে কত্তে পারে বল্ দেখি।”

পার্কস্‌তীর নিঃশ্বাস যেন কদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে আরক্তমুখে দৃক্‌দ্বায়ে জিজ্ঞাসা করিল, “বৌ এমন সব কথা বলে?”

বামুনদিদি বলিলেন, “না বললে আমরা শুনলুম কোথা থেকে বল্। আমি তো মনে মনে গ’ড়ে তোকে বলছি না। তোরা নিন্দে ক’রে আমার কোন লাভও নাই। এমন স্বভাবই নয় আমার, পরের নিন্দে শুনলে আমি কাণে আঙুল দিয়ে চ’লে যাই। তোরা বামুনদাদা কত শাস্ত্র পড়েছে জানিস্‌ তো। তিনি বলেন, গিরি, পরনিন্দার মত পাপ নাই।”

বামুনদিদির আত্মদোষক্ষালনের জন্য এইসকল যুক্তিমূলক উক্তি পার্কস্‌তীর কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, বলা যায় না। কেন না, সে তখন গভীর বিশ্বয়ন্তক হৃদয়ে শুধু একটা কথাই ভাবিতেছিল—বৌ এমন কথা বললে।

অতঃপর বামুনদিদি বারবার পার্কস্‌তীকে সতর্ক করিয়া দিলেন, তিনি যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, ইহা যেন বৌয়ের কাছে প্রকাশ না হয়। কারণ, অহেতুক তিনি কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে ইচ্ছুক নহেন। তা ছাড়া, তিনি এমন সব ঘূণিত কথার সংশ্রবে রহিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে তাহার বামুনদাদা রক্ষা রাখিবেন না। তিনি পরের কথায় থাকা আদৌ পছন্দ করেন না। সুতরাং তাঁহার মাথার দিব্যি, পার্কস্‌তী যেন

আমীর ঘর

তাহার নাম ঘুণাকরেও প্রকাশ না করে। কাহারও কথায় না থাকিলেও তিনি শুধু পার্শ্বতীকে বড়ই ভালবাসেন বলিয়াই তাহাকে এই সব কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

এইরূপে পার্শ্বতীকে সাবধান করিয়া দিয়া বামুনদিদি প্রস্থান করিলেন। পার্শ্বতী রোমে ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে ঢুকিয়াই পার্শ্বতী ডাকিল, “বৌ।”

লক্ষ্মী তখন শুকনা কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল; পার্শ্বতীর সক্রোধ আহ্বান শ্রবণে যেন নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উৎস্রক নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বতী রাগে চোখ কপালে তুলিয়া, তাহার মুখের উপর জনস্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বৌ, গমনার ভরে পাঁচজনের কাছে হুখ্য করলেই কি পাঁচজন তোর গমনা এনে দেবে?”

নতমুখে নিম্ন অথচ তীব্রস্বরে লক্ষ্মী উত্তর করিল, “পাঁচজনের কি এমন দায় পড়েছে যে, আমার গমনা এনে দিতে যাবে?”

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে পার্শ্বতী বলিল, “তবে পাঁচজনের কাছে হুখ্য জানিয়ে বেড়াতে বাস কেন?”

লক্ষ্মী বলিল, “কি এমন হুখ্য করে বেড়িয়েছি আমি?”

আমীর ঘর

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া পার্কীতী বলিল, “কি হুখা করেছিস! শুধু হুখা কেন, আমার কত নিন্দে করেছিস, বল দেখি।”

যেন নিতান্ত নিরপরাধীর মত কাঁদ-কাঁদ মুখে লক্ষ্মী বলিল, “ও মা, তোমাব নিন্দে আমি কার কাছে করেছি আবার?”

তর্জ্জনসহকারে পার্কীতী বলিল, “যাবা আমার চেয়েও তোর আপনাব, তাদের কাছেই কবেছিস।”

“কি নিন্দে কবেছি আমি?”

“মেয়েমানুষেব যার চেয়ে আব নিন্দে নাই, সেই নিন্দেই করেছিস।”

লক্ষ্মী নীববে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্কীতী বলিল, “এত মিথ্যে তুই শিশুগুি কোথা হ’তে বল দেখি? তোব গয়না নেবার তরে আমি বাশীকে যুক্তি দিয়েছিলাম?”

লক্ষ্মী বিবক্তিকুঞ্চিত মুখানা ঘুবাইয়া লইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, “তুমি যুক্তি দিয়েছ, কি আর কেউ যুক্তি দিয়েছে, কে তার গবর বাধে?”

অনুটী কবিয়া পার্কীতী বলিল, “গবর রাখিস না, কিন্তু পাডায় পাডায় তো ব’লে বেড়িয়েছিস?”

টোঁট ফুলাইয়া লক্ষ্মী বলিল, “হাঁ, আমি তোমার মত তিন বেলা পাডায় পাডায় ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখতে পাও না।”

পার্কী। তবে পাডায় লোক এত কথা জানলে কি ক’রে?

লক্ষ্মী। সত্যি কখনও চাপা থাকেনা।

লক্ষ্মীর এ উত্তরে পার্কীতী যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহা হইলে লক্ষ্মীর ধারণা, পার্কীতী সত্যই দোষী! পার্কীতী বিশ্বয়চমকিত দৃষ্টিতে

আমীর খর

লক্ষ্মীর রোষকুক্ষিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া দুঃখ গভীরকণ্ঠে ডাকিল, “বৌ।”

লক্ষ্মী মুখটা একটু তুলিয়া পার্শ্বতীর দিকে একটা তীর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পার্শ্বতী বলিল, “দেখ বৌ, অনেক স্থানের আশা ক’রে বাণীর বিয়ে দিয়েছিলাম।”

উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে পার্শ্বতীর কণ্ঠ কঁদ হইয়া আসিল। কথাটা বলিতে ঠোট ছইটা যেন ফুলিয়া উঠিল। তাহার এই নৈবাশ্রের অশ্রুশাশি কিন্তু লক্ষ্মীর অন্তরকে স্পর্শ কবিল না, সে গভীর অবজ্ঞায় নাসাগ্র কুক্ষিত করিয়া পরম্বকণ্ঠেই বলিল, “তার বিয়ের তবে আমি কারও পায়ে গড়াগড়ি দিই নাই।”

কাতরতার উত্তরে লক্ষ্মীর এই নিষ্ঠুর উক্তি পার্শ্বতীকে ধৈর্য্যচ্যুত করিল; সে ক্রোধে আত্মহাবা হইয়া গর্জন কবিয়া বলিল, “ভদ্রলোকের মেয়ে হ’লে পায়ে গড়াগড়ি দিতিস্ বৌ, কিন্তু নেহাৎ ছোট লোকের মেয়ে তুই—তোর কাছে সে রকম আশা করাই অজ্ঞায়।”

এই কটুক্তিতে লক্ষ্মী এবার ক্রোধে রণচণ্ডিকা-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “আমি ছোটলোকের মেয়ে হ’লে এতদিন তোমাকে ভায়ের ভাত খেতে হ’ত না ঠাকুর-ঝি।”

গর্জনসহকারে পার্শ্বতী বলিল, “কেন, তুই কত্ভিস কি?”

রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমাকে কিছু কত্তে হ’তো না, তোমার আদরের ভাই-ই তোমার মুখে চুণ-কালি দিয়ে মাখায় ঘোল ঢেলে বাড়ীর বার করে দিতো।”

“তুই বুঝি তাকে আটকে রেখেছিস্?”

স্বামীর ঘর

মুখ বিকৃত করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “রেখেছিই তো। আর সতীগিরী নাভা দিওনা ঠাকুর-বি, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।”

চীৎকার করিয়া পার্শ্বতী বলিল, “কি, এতদূর আশ্পর্ক তোরা?”

লক্ষ্মী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই বাণী বাড়ীতে চুকিতে চুকিতে জিজ্ঞাসা করিল, “কার এত আশ্পর্ক দেখলে দিদি।”

তাহাকে দেখিয়া পার্শ্বতী চমকিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহার মুখের উপর একটা ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিল।

বাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কার এত আশ্পর্ক হয়েছে দিদি? বোয়েব নাকি।”

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে পার্শ্বতী বলিল, “না বাণী, আশ্পর্ক আমারই হয়েছে। তোদের আর কিছু কত্তে হবেনা, আমি নিজেই মানে মানে - এখান থেকে চ’লে যাচ্ছি।”

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাবে?”

পার্ক। কেন, তোরা ঘর ছাড়া আমাব কি আর ঘাবার জায়গা নাই?

বাণী। তা আছে, কিন্তু কেন যাবে শুনি?

পার্ক। আমার খুসী, আমি যাব।

বাণী। শুধু খুসী বললে তো হবে না, কেন যাবে সেটা বলা চাই।

পার্ক। আমি নিজে না গেলে শেষে তুই আমাকে ঘাড়ে ধ’রে বাড়ীর বার ক’রে দিবি তো? তার চেয়ে আগেই মানে মানে চ’লে যাচ্ছি।

আমীর ঘর

পার্বতীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “নিশ্চয় যাবে ?”

পার্বতী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, “নিশ্চয় যাব ।”

“আচ্ছা, দাঁড়াও” বলিয়া বাণী ক্ষতপাদবিক্ষেপে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং ঘর হইতে একখানা মোটা লাঠী বাহির করিয়া পার্বতীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মনে আছে দিদি ?”

পার্বতী । কি মনে থাকবে ?

বাণী । যেদিন বিয়েতে মত দিই, সেদিন বলেছিলাম, এই লাঠী তোলা বইলো ।

কথাটা স্মৃতিপথে আসিলে পার্বতী আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল । কি জানি, এই লাঠী বৌয়ের মাথায় মারিবে নাকি ?

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, “এখন এই লাঠী কার মাথায় পড়বে, বল দেখি ?”

পার্বতী উত্তর করিল, “আমার মাথায় ।”

রাগে চোখ পাকাইয়া গর্জন করিয়া বাণী বলিল, “তোমার মাথাতেও পড়বে, কিন্তু আগে নয় । যার জন্তে তুমি চ’লে যাচ্ছো আগে তার মাথায় পড়বে, তারপর তুমি, শেষে আমার নিজের মাথা আছে ।”

বাণীর চোখ দুইটা ক্রুদ্ধ স্থাপদের ক্রায় জলিয়া উঠিল । শঙ্কিতভাবে পার্বতী বলিল “বৌয়ের দোষ কি বাণী ?”

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বাণী বলিল, “কে দোষী তুমি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও তা জানতে আমার বাকী নাই । তবে দোষ তোমারও নেহাৎ কম নয়, দোষীর অপরাধ লুকিয়ে রেখে তুমিও খুব দোষী হয়েছ । দোষ আমারও আছে, কেননা, সব জেনে শুনে আমিও এতদিন চুপ ক’রে

স্বামীর ঘর

বয়েছি। আজ কিন্তু আমি সকল দোষের প্রতিবিধান কববো, কেউ আজ রেহাই পাবেনা।”

লক্ষ্মী ঘরের দাবার উপর খুঁটা ধরিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঁশী লাঠীখানা বাগাইয়া ধরিয়া দাঁতে ঠোট চাপিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। ভয়ে পার্শ্বতীর মুখ শুকাইয়া গেল, সেদিকে ছুটিয়া বাঁশীর সন্মুখে গিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “তুই পাগল হ’য়েছিস বাঁশী? বোয়ের কোন দোষ নাই। আমিই সকল অশান্তির মূল, আমি চ’লে গেলেই সব গোল চুকে যাবে।”

শ্লেষপুরুষকণ্ঠে বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যি না কি?”

শান্ত-কোমলস্বরে পার্শ্বতী বলিল, “আচ্ছা, তুই দেখে নিস, আমার কথা ঠিক কিনা। বো তো আর ছেলেমানুষটী নয়, সে নিজের ঘবসংসার চিনে নিয়েছে, আমি না থাকলেও তোর আর কোন কষ্ট হবে না।”

বাঁশী যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে জলন্তদৃষ্টিতে একবার বোয়ের দিকে, আরবার পার্শ্বতীর দিকে চাহিতে লাগিল। লক্ষ্মী এতক্ষণ নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ সে ঠিক পাগলের মত ছুটিয়া আসিল এবং পার্শ্বতীর পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে অভিমানস্বরকণ্ঠে বলিল, “দোহাই ঠাকুরবি, তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নাই, আমিই বাড়ীর আপদ, আমাকে দূর ক’রে দাও।”

লক্ষ্মী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই উন্মত্তবৎ আকস্মিক কাণ্ডে পার্শ্বতী ক্ষণকালের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেল।

এমন সময় “বড় বো, বড় বো কোথায় গো!” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কালাচাঁদের ভাই গোরাচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহাকে

আমীর ঘর

দেখিয়া বাঁশী হাতের লাঠী ফেলিয়া দিল, পার্শ্বতী সম্ভ্রান্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।

গোরাচাঁদ সম্মুখে পার্শ্বতীকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, “দাদার বড্ড কঠিন ব্যারাম বড বোঁ, আমি পাকী নিয়ে এসেছি, এখুনি আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।”

পার্শ্বতী ক্রোধের পাশ দিয়া যেন একটা বাজ ডাকিয়া গেল। সে ভীতিবিবর্ণ মুখে কাঁপা-গলায় ভূতলে উপবিষ্ট লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “দেখিস বোঁ, ঘরসংসার রইলো, বুঝে শুঝে চলবি। আগি চলুম, আমার গহনাগুলো তোকে দিয়ে গেলুম।”

বাঁশী বা লক্ষ্মী কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পার্শ্বতী যে কাপড় পরিয়াছিল, সেই কাপড়েই একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে অবস্থিত পাকীতে উঠিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ তাহার পশ্চাৎ আসিয়া পাকী উঠাইতে বলিলে বাহকেরা পাকী কাঁধে তুলিয়া ধাবমান হইল।

বাঁশী কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ যেন সংজ্ঞা পাইয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, সেখানে পার্শ্বতী নাই, পাকী নাই, কেহই নাই। বাঁশী সেইখানে ধুলার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পাকী আসিয়া কালাচাঁদেব বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইলে পার্শ্বতী পাকীর দরজা খুলিয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া পড়িল, এবং বৃকের ভিতর উৎকর্ষাব একটা মুহূ কম্পন লইয়া অস্থিরপদে বাটার মধ্যে প্রবেশোদ্ধত হইল। কিন্তু দরজার সম্মুখে গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ওঃ, কতদিনেব পবিচিত পুরাতন এই বাড়ীগানা। কিন্তু আজ তাহাব কাছে ইহা কত নূতন—কত অপবিচিত। একদিন সে কি অভিমান লইয়া এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু আজ অপমানের কি তীব্র বেদনা বৃকে চাপিয়া এই বাড়ীর দরজায় মাথা গলাইতেছে। এই দরজায় মাথা গলাইবাব জন্ত সে স্বামীব কত সাদব আহ্বান, কত সকাতির অনুনয়-বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছে, জীবনে কখন এই বাড়ীর দরজায় মাথা গলাইবেনা বলিয়া একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সে দৃঢ়তা—সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ গোরাচাঁদ গিয়া তাহাকে একবারমাত্র ডাকিতেই সে দ্বিক্রান্তির অবসব মাত্র না পাইয়া এই দরজায় মাথা গলাইতে আসিয়াছে। সে কি শুধু কালাচাঁদের অস্থখ শুনিয়াই এমনভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে? এমন অস্থখের সংবাদ তো সে কতবার পাইয়াছে, কিন্তু কোনবাবেই তো এমন আগ্রহ—এত ব্যস্ততা লইয়া ছুটিয়া আসে নাই? তবে আজ কেন আসিল? কেন আসিল তাহা মনে করিতে পার্শ্বতীর মাথাটা স্বামীগৃহের দরজার

আমীর ঘর

পাশে যেন লুটাইয়া পড়িতে উদ্ভত হইল। পার্শ্বতী শুষ্ক ব্যথিত হৃদয়ে সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে ছায়াময় দরজার পাশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং কিরূপে কত বৈধো হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া এই দরজাটুকু পার হইবে, তাহাই ভাবিয়া যেন আবুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইলনা, চঞ্চল বিদ্যুতের মত এক তমস্রী যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া কেলিল, এবং যেন কত আগ্রহে—কত আদরে বলিয়া উঠিল, “আঃ, বাঁচালে! তুমি এয়োচো দিদি?”

বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া পার্শ্বতী একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি—তুনিই কি বমা,—খোকার মা?”

যুবতী হাসিয়া উত্তর করিল, “আমি বমা বটে, কিন্তু খোকার মা কি না, সে কথা খোকার বাপকে জিজ্ঞাসা ক’রো।”

বলিয়াই সে পার্শ্বতীর বাহু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইল। পার্শ্বতী যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “খোকার বাপ কেমন আছে?”

বমা বলিল, “ভালই আছে। ডাক্তার ব’লে গেল আব কিছু ভয় নাই, দু’তিনদিনে সেরে উঠবে।”

পার্শ্বতীর উদ্বেগ-বিমলিন মুখে অনেকটা নিশ্চিন্ততার ছায়া দেখা দিল। বমা হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর বসাইল, এবং অবিলম্বে খোকাকে আনিয়া তাহার কোলে বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “এইবার কে খোকার সত্যিকার মা, তা জানা যাবে।”

সোয়ামীর ঘর

পার্করী হাসিয়া খোকার ক্ষুদ্র নবনীত-সুকোমল কপোলে স্নেহচূষন প্রদান করিল।

সরকারদের আগেকার বড বৌ আসিয়াছে, ইহা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। এ সংবাদ যে শুনিল, সেই ছুটিয়া সরকারদের বড বৌকে দেখিতে আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে একপাল ছেলেমেয়ে, ছেলের মা, নবীনা, প্রবীণা, প্রোচা, যুবতী আসিয়া পার্করীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে খুব একটা কোঁতুকজনক দৃষ্টির আয় দর্শন করিল। আপনাদেব কোঁতুল-প্রযুক্তিকে চরিতার্থ করিতে থাকিল। সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে চাপাগলার নানাবিধ জল্পনা-কল্পনাও চলিতে লাগিল, “আহা, এমন দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে গা, এমন মেয়ে সোয়ামীর ঘর কত্রে চাঁষ না?”

“ঘর কত্রে চাইবে কি, সোয়ামীর ঘর কত্রে গেলে ভায়ের ঘর যে ভেসে যায়।”

“আবে রেখে দে তোর ভায়ের ঘর। বলে, ভায়ের ভাত, ভাজের হাত।”

“এদ্বিনে বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছে, তাই সোয়ামীর ঘর কত্রে এয়েছে।”

“তাহ’লে দেখছি, এবার নূতন বৌটা ভাসলো।”

“তাকে আর ভাসায় কার সাদি, সে এখন ছেলের মা।”

চাপাগলায় কথাবার্তা হইলেও কথাটা রমার কাণে গেল, যাইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না গো না, আমি খোকার মা নই, খোকার মা ঐ আজ এসেছে।”

বলিয়া সে পার্করীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। পার্করী মুগ্ধ

স্বামীর স্বর

স্ফুল দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিল।
উপস্থিত রমণীবৃন্দ বুদ্ধিহীনা রমার দিকে বিষয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অতঃপর সকলে রমা ও পার্শ্বতীর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে শকাঙ্কনক আলোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ সকল সমালোচনায় যোগদান করিতে পারিলনা, তাহারা শুধু হাঁ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নবাগতা ও অদৃষ্টপূৰ্ব্ব। বৌটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের নিত্য পরিদৃষ্ট গ্রানের অন্তান্ত বধু হইতে এই বৌয়ের মুখে বা চেহারায় কিছুমাত্র বিশ্বয়কর নূতনত্ব দেখিতে না পাইয়া হতাশভাবে দৃষ্টি প্রত্যাবর্তনপূৰ্ব্বক এই বৌ অপেক্ষা বহির্দ্বারে অবস্থিত পাকীখানিকে স্নদৃষ্টজ্ঞানে সেইদিকে খাণ্ডিত হইল, এবং পাকীখানা নূতন কি পুরাতন ; বামুদের বৌ যে পাকীতে আসিয়াছিল সেই পাকী অপেক্ষা এই পাকীটা ভাল না মন্দ, এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক কবিত্তে কবিত্তে পবিশেষে পরস্পর মতানৈক্য জন্ত কলহে প্রবৃত্ত হইল, এবং কলহ করিতে করিতেই বর্ষীয়সীদের পশ্চাৎ অন্তসরণ করিল।

প্রতিবেশীদের তীত্র সমালোচনাব হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া পার্শ্বতী খোকাকে লইয়া কালাচাঁদের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

কালাচাঁদের রোগটা প্রকৃতই যে মারাত্মক হইয়াছিল, তাহা নহে, মাত্র তিনদিনের জ্বর, কিন্তু তৃতীয়দিবসে জ্বর যখন ১০১ হইতে হঠাৎ ১০৬ ডিগ্রীতে উঠিয়া পড়িল, তখন নূতন ডাক্তার নীরদবাবু জ্বরটাকে টাইফয়েড বিবেচনায় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার যখন শঙ্কিত হইলেন, তখন গৃহস্থের আশঙ্কার সীমা রহিল না। ইহার উপরে জ্বরের প্রকোপে কালাচাঁদ মধ্যে মধ্যে যখন প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন সকলে বিকার উপস্থিত হইয়াছে

স্বামীর স্বর

ভাবিয়া ভয়ে মুহূমান হইয়া পড়িল। প্রলাপের মধ্যে বার বার পার্কতীর নাম শুনিয়া রনা মপত্নীকে লইয়া আসিবার জন্য উৎসুক হইল; সে গোবাচাঁদকে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, “যেরকমে পার, দিদিকে নিয়ে এসো ঠাকুবপো, নইলে ও বন্ধা পাবে না।”

বমার কাতরোল্লিতে বাধ্য হইয়া গোবাচাঁদ একেবারে পার্কী লইয়া পার্কতীকে আনিতে গেল।

বাত্রিতে জরটা বাড়িয়া উঠিলেও প্রভাতের পর ধীরে ধীরে কনিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পর ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, জ্বরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীরও কম। উপসর্গ কিছু নাই, নাড়ীও পরিষ্কার দেখিয়া তিনি নিশ্চিতচিত্তে উপস্থিতমত ঔষধের ব্যবস্থা কবিয়া গৃহস্থকে অভয় দিয়া গেলেন।

পার্কতী যখন কালাচাঁদের নিকট উপস্থিত হইল, কালাচাঁদ তখন বালিসে ভর দিয়া একটু কাৎ হইয়া বসিয়াছিল, পার্কতীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মুখের উপর দিয়া যেন একটা বিশ্বয়বিজড়িত আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। পার্কতী ধীরে ধীরে তাহার পায়েব কাছে গিয়া পায়েব ধূলা লইল, তারপর নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ?”

কালাচাঁদ সহাস্ত্রমুখে উত্তর দিল, “ভাল আছি। তুমি কখন এলে?”

“এই একটু আগে।”

“বাঁশীকে ফেলে আসতে পারলে?”

কালাচাঁদের স্বরে ঈষৎ শ্লেষের তীব্রতা অনুভব করিয়া আরক্তমুখে পার্কতী উত্তর করিল, “দরকার পড়লে যখন তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি, তখন বাঁশীকে ফেলে আসা যায় না?”

আমীর ঘর

উপযুক্ত উত্তর পাইয়া কানাচাঁদ অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিল,
“বানী, বো, ভাল আছে তো?”

পার্কতী উত্তর দিল, “হা।”

কানাচাঁদ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, “আমার জ্বর বেশী দেখে
ওরা ভয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তোমাকে আনতে
গিয়েছিল।”

ঈশৎ হাসিয়া পার্কতী বলিল, “তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বারণ
কত্রে বোধ হয়।”

কানাচাঁদ হাসিয়া উত্তর করিল, “এখানে এলে যখন তোমার নানা
অসুবিধা হয় তখন বারণ করাই ঠিক নয় কি?”

পার্কতী খোকার গলার পদকটা নাড়িতে নাড়িতে সলজ্জমুখে বলিল,
“সুবিনা অসুবিধা সব ঠেলে কেলে যখন এসে পড়েছি, তখন এবার কি
বলতে চাও? চ’লে যেতে বল কি?”

পার্কতীর মুখখানা রাগে যেন একটু ভারী হইয়া আসিল। ঈশৎ
শঙ্কিতভাবে কানাচাঁদ বলিল, “এমন কথা তোমাকে কখন বলেছি কি
পার্কতি?”

পার্কতী নীরবে গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কানাচাঁদ বলিল,
“দেখছি, আমার ওপর তোমার রাগ এখনও যায়নি।”

দীপ্তকণ্ঠে পার্কতী বলিল, “কখনও যায়নি।”

তাহার রোবদীপ্ত মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া
কানাচাঁদ বলিল, “এত রাগ ঠেলে তুমি যে আনতে পেরেছ পার্কতি,
আশ্চর্য্য!”

খোকার মাথার চুলগুলো পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে পার্কতী গম্ভীর-

আমীর খয়র

কণ্ঠেই উত্তর করিল, “পুরুষমানুষ বলেই আশ্চর্য্য মনে কচ্চো, মেয়েমানুষ হ’লে তা কত্রে না।”

কালার্টাদ হাসিয়া বলিল, “আর মেয়েমানুষ না হলে তুমি সেই একটু অভিমানকে তুষের আগুনের মত জাগিয়ে রেখে এতকাল আমাকে ঠেলে রাখতে পারতে না।”

সতেজবর্ণে পার্করী বলিল, “কে বললে তোমাকে আমি ঠেলে রেখেছি ? সে ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহ’লে আজ এমন এক কাপড়ে ছুটে আসতাম না।”

মৃদু শ্লেষ-হাস্যসহকারে কালার্টাদ বলিল, “ছুটে এসেছ পার্করী, কিন্তু সেই কতকালের অভিমানটুকু সঙ্গে নিয়ে এসেছ।”

পার্করী মুখখানাকে ভারি করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কালার্টাদ সহাস্যমুখে বলিল, “তা আমার ওপর অভিমান রাখতে পারবে, কিন্তু খোকার ওপর তো অভিমান করলে চলবে না ?”

স্নেহ-প্রফুল্লদৃষ্টিতে খোকার মুখেব দিকে চাহিয়া পার্করী বলিল, “কেন চলবে না ? খোকা এত বাহাদুর হয়ে উঠেছে নাকি ?”

খোকা তাহার মুখে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, “আম্মা—আম্মা।”

পার্করী সহাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে তিরস্কারের স্বরে বলিল, “মা, কে তোরা মা রে ? একবন্দি ছেলে, এরি মধ্যে পরকে মা ব’লে ডাকতে শিখেছ !”

তাহার এই তিরস্কারে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া খোকা পূর্ব্ববৎ পার্করীর মুখে হাত চাপড়াইয়া অশ্রুটকণ্ঠে ডাকিল, “আম্মা—আম্মা।”

“তবে রে রাজী” বলিয়া পার্করী তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

আমীর ঘর

পার্কীতী বাহিরে আসিলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, “কি দিদি, মান ভাঙলো?”

পার্কীতী উত্তর করিল, “এ মান কি ভাঙবার যে, এক কথায় ভেঙে যাবে?”

রমা হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা মান ভাঙে কি না, দেখে নেব। পায়ে ধরলেও কি এ মান ভাঙবে না?”

সহাস্ত তর্জনসহকারে পার্কীতী বলিল, “মুখে ছাই, পায়ে ধরবে কে?”

“যার বেশী গরজ!”

“বেশী গরজ তো দেখছি তোর।”

“বেশ, আমিই পায়ে ধরবো।”

“তবে ধর।”

বলিয়া পার্কীতী নিজের একটা পা রমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রমা দুই হাতে তাহার পা-খানা জড়াইয়া ধরিয়া হাসি চাপিয়া স্বরের সহিত বলিল, “মানিনি গো, দয়া ক’রে মান ত্যাগ কর। তোমার মান ভাঙলে আমি পাঁচপয়সার হরির লুট দেব।”

বলিতে বলিতে রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পার্কীতী তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। সপত্নীত্বের দ্বীতি-রোলে বাড়ীখানা পর্য্যন্ত যেন হাসিয়া উঠিল।

পিসীমা ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে রমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বলি, ওগো বড়মানুষের মেয়েরা, দিনরাত হাসি-তামাসা নিয়েই থাকবে, আর এই বাদী মাগী নাকমুখ ওঁড়ে খেটে মরবে? তা আমি মরি মরবো, কিন্তু রেতের বেলা গেরস্তবরের মেয়ের এত হাসিও ভাল নয়। বলে, ষত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।”

স্বামীর ঘর

সচকিতে রমা বলিল, “ঐ গো দিদি, হাসির আওয়াছ কাণে না বেতেই পিসীমা কান্নার স্বর তুলে দিয়েছে। ব’সো তুমি, আমি পিসীমার কাছে গিয়ে একটু কেঁদে আসি।”

রমা হাসিতে হাসিতেই ছুটিয়া পলাইল। পার্শ্বতী একা বসিয়া, এই মেয়েটা কোন ধাতুতে গড়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বেণী জিজ্ঞাসা করিল, “কি হে বংশীবদন, দিদি আর আসবে, না সেইখানেই থাকবে?”

বাঁশী নিতান্ত উপেক্ষার স্ববে উত্তর দিল, “আসতেও পারে, সেখানে থাকতেও পারে।”

বেণী। তুমি আনতে গিয়েছিলে কি?

বাঁশী। না।

বেণী। কেন যাওনি?

- বাঁশী। কি জন্যে আনতে যাব?

বেন খুব আশ্চর্যের সহিত বেণী বলিল, “বল কি হে, কি জন্যে আনতে যাবে? যে দিদি তোমাকে এত ক’রে মাহুঁষ করলে, সে যদিই রাগ করে চলে যায়—”

বিরক্তভাবে বাধা দিয়া বাঁশী বলিল, “কে বললে, রাগ ক’রে চ’লে গিয়েছে?”

আমীর ঘর

মৃদু-গভীর হাস্যসহকারে বেণী বলিল, “সকলেই তো এই কথা বলছে। অনেকে আবার বলে—”

বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “কি বলে?”

বেণী বলিল, “বলে, তুমি নাকি তাড়িয়ে দিয়েছ।”

বাঁশীর জয়গল কুঞ্চিত হইল। বেণী বলিল, “আমি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করি না।”

বাঁশী। কেন কর না?

বেণী। এতটা নিমকহারাম কখনই তুমি হ’তে পারবে না।

স্রোর গলায় বাঁশী বলিল, “খুব হ’তে পারি। তা না হ’লে—যাক, তোমার বিয়ে চুকে গিয়েছে?”

বেণী বলিল, “হাঁ, আইবুড়ো নামটা খণ্ডে গিয়েছে বটে।”

বাঁশী। কেন বৌ পছন্দ হয়নি?

বেণী। খুব পছন্দ হ’য়েছে। এমন বোবা বৌ যদি পছন্দ না হবে তাহ’লে এত যে নাটক-নভেল পড়লুম, সব বাজে হ’য়ে যায় যে।

বাঁশী। বল কি, বৌ বোবা?

বেণী। শুধু বোবা? কাল, তার উপর খোঁড়া। ঘটক ব্যাটা আচ্ছা ঠকিয়েছে। যা হোক, রান্ধেলকে একবার হাতে কাছে পেলে হয়।

বাঁশী একটু হাসিয়া বলিল, “ঘটকের উপর রাগ ক’বো না মাষ্টার, সে তোমার মন্দ করে নাই বরং খুব উপকারই করেছে।”

বেণী বলিল, “হাঁ কম উপকার করেছে কি? ব্যাটা ‘ননুসেন’—আমার লাইফটাকেই নষ্ট ক’রে দিলে!”

বেণী বিষাদের গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বাঁশী বলিল,

স্বামীর ঘর

“তুমি বুঝতে পাচ্চো না মাষ্টার, বৌ বোবা না হ’য়ে যদি কথা কইতে পারতো, তা হ’লে দেখতে, দিনরাত তোমার পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া ক’রে তোমাকে অস্থির ক’বে তুলতো। আমার দিদির না হয় স্বামীর ঘর আছে, সেখানে চ’লে গেল, কিন্তু তোমার বুড়ো পিসী কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে বল দেখি?”

দুঃখ-কাতরস্বরে বেণী বলিল, “আরে, রেখে দাও পিসী। মনের মত বৌ হ’লে এমন দশটা পিসী জাহান্নমে গেলেও ক্ষতি নাই।”

বাঁশী হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে ঘটক তোমাব ক্ষতি করেছে বটে, কিন্তু আমি আগে জান্লে বোবা বৌ এনে দেবার তরে এই ঘটকের পায়ে ধরতাম।”

শ্লেষভীড়কণ্ঠে বেণী বলিল, “দিদির ওপব তোমাব যে অচলা ভক্তি দেখছি। তাই বুঝি দিদিকে আর আনতে চাও না?”

দৃঢ়স্বরে বাঁশী উত্তর দিল, “হ্যাঁ।”

“আর বোধ হয় আনতে যাবে না?”

“না।”

“চমৎকার। থ্যাঙ্ক ইউ” বলিয়া বেণী উপহাসের সহিত বাঁশীকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

বাঁশী মুখে ‘না’ বলিল বটে, কিন্তু দিদিকে লইয়া আসিবার জন্ত তাহার প্রাণের ভিতর কি যে করিতেছিল, তাহা বাঁশীর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানে না। পার্শ্বভী যখন বাঁশীকে একটি মাত্র কথা না বলিয়া, আকস্মিক ঝড়ের মত বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তখনও বাঁশী মনে করে করে নাই যে, দিদি সত্যিই চলিয়া যাইবে। তাহাকে ফেলিয়া দিদি কি যাইতে পাবে? সে দিদিই তাহার নয়! কিন্তু পার্শ্বীর বাহকদিগের

স্বামীর ঘর

অশ্রুট রব কর্ণগোচর হইলে বাঁশী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, দিদি নাই, তাহার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া দিদি সত্যিই চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্বতীর এই অতর্কিত প্রস্থানে বাঁশী হৃদয়ে এমন অঘাত পাইল যে, সেই কঠোর আঘাতে সে যেন মুহূর্ত্তমান হইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত রহিল না।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দুঃখের পরিবর্তে একটা প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার হৃদয়টা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কি, পরেব মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া দিদি তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঠিক পরের মত চলিয়া গেল। আচ্ছা, বাক্,—বাঁশীও রাগ কবিত্তে জানে, সেও দিনিবে দেখাইবে, যাহাদের দিদি নাই, তাহারাও বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাঁশী ঘবে আসিলে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুব-ঝি চ’লে গেল না কি?”

বাঁশী উত্তর দিল, “হাঁ।”

আশ্চর্য্যাস্থিতভাবে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “ওমা, সত্যি সত্যিই চ’লে গেল? আচ্ছা তো রাগ দেখছি।”

বাঁশী তাহার এই বিশ্বয়ম্ভূতক উক্তির কোন উত্তর দিল না। লক্ষ্মী বলিল, “তা কিবিষয়ে আনতে চেষ্টা করলে না কেন একবাব?”

রোষ-প্রদীপ্তকণ্ঠে বাঁশী উত্তর দিল, “দরকার?”

লক্ষ্মী বলিল, “রাগ ক’রে যাচ্ছে, কিরিয়ে আনতে না গেলে মনে করবে কি?”

তাহার মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষ-বিকৃত-কণ্ঠে বাঁশী বলিল, “যা খুসী, তাই মনে করবে। আমি কখনও তার খোসামোদ কত্তে যাব না।”

আমার স্বপ্ন

তাহার রাগ দেখিয়া লক্ষ্মী আর কিছু বলিতে পারিল না।

সেদিনটা এইরূপ রাগে-রাগেই কাটিল। পরদিন রাগটা যতই একটু একটু কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার দৃষ্টিতে বাড়ীঘর সব যেন ফাঁকা ফাঁকা হইয়া উঠিল। কিছুই ভাল লাগে না। বাড়ীতে টিকিতে না পারিয়া বাঁশী বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই পার্করতীৰ কথা জিজ্ঞাসা করে। পার্করতী কেন চলিয়া গেল, রাগ করিয়া গিয়াছে কিনা, কবে আবার ফিবিয়া আসিবে, বাঁশী তাহাকে ফিবাঁইয়া আনিতে যাইবে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাঁশী বিবক্ক হইয়া উঠিল। পরিশেষে এইসকল বিরক্তিকর প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বাড়ীতে পলাইয়া আসিল।

কিন্তু বাড়ীতেও স্বস্তি নাই, পার্করতীৰ অভাবে বাড়ীখানা যেন একেবারে নির্জন নিস্তর হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মী একা সে নির্জনতা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না, তাহার কণ্ঠস্বর নির্জন প্রান্তর মধ্যে পেচকের কণ্ঠস্বরের মত বাড়ীখানার স্তর গাভীৰ্য্যকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। বাঁশী স্ত্রীর সহিত কথা কহিয়া এই অসহ্য গাভীৰ্য্যকে লঘু করিয়া আনিতে চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, লক্ষ্মীর মধুরতা-বজ্জিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে দিদিব স্নেহাৰ্দ্ৰ মিষ্ট কথাগুলি মনে পড়ায় বাঁশী হতাশ হইয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

অনান্তে বাঁশী আহারে বসিলে লক্ষ্মী তাহার কোলের কাছে ভাতের খালা ধরিয়া দিল। লক্ষ্মী অবশ্য স্বামীর সন্তোষের জন্য যত্নসহকারেই রন্ধন করিয়াছিল, কিন্তু এত যত্নেও সে অন্নব্যঞ্জনব মধ্যে পার্করতীর হাতের মিষ্ট আশ্বাদ আনিতে পারে নাই। কাজেই সে অন্নব্যঞ্জন

বান্দীর ঘর

বান্দীর তৃপ্তিকর হইল না। স্বতরাং অর্দ্ধাশন না হইতেই সে বিরক্তির সহিত উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “এত ভাত প’ড়ে বইলো যে?”

বিকৃত মুখে বান্দী উত্তর দিল, “ক্ষিদে নাই।”

কেন যে ক্ষিদে নাই, তাহা বুঝিতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, উপায় নাই। স্বতরাং সে মনে মনে দুঃখ অনুভব করিল মাত্র।

আহারান্তে বান্দী ছিপ লইয়া বাহির হইল। কিন্তু কি আপদ, চারে আজ একটা মাছেরও সাড়া-শব্দ নাই। পুকুরটা মৎস্যশূন্য হইয়াছে। খানিকক্ষণ ফাংনাব দিকে চাহিতে চাহিতে চোখ দুইটা যখন জালা লবিতে লাগিল, তখন বান্দী বিরক্তির সহিত ছিপ-শুটাইয়া উঠিয়া পড়িল। নিকটেই গোপাল কামার ছিপ ফেলিতেছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি বাবাজি, আজ এরি মধ্যে উঠে পড়লে যে?”

বান্দী বলিল, “ভাল লাগছে না, বেজায় রোদ।”

সন্ধ্যার পর গভীর অন্ধকারে বাড়ীখানা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে বান্দীর মনে হইল, এমন গাঢ় অন্ধকার আর কোন দিনই সে দেখে নাই। বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্তার নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন শ্বাসরোধকারী স্তব্ধ অন্ধকারের নিবিড়তা আজ যেন তার কাছে সর্বাপেক্ষা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভীষণ স্তব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দাবার উপর বসিয়া বান্দী যতই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টিত হইল, ততই তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে লাগিল—দিদি, দিদি! বান্দী ক্রোধ ও অভিমানের আবরণ দিয়া সে আবুল আছানটাকে ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত

স্বামীর ঘর

হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা চাপা পড়িল না। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখ দিয়া মোটা মোটা কয়েকবিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবিন্দু অন্ধকাবে আর কেহ দেখিতে পাইল না, বাশী নিজেই তাহা অনুভব করিয়া ব্যস্তভাবে কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিল। তারপর সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া গম্বীর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

খুম কিন্তু কিছুতেই চোখে আসে না। বাশী বিছানায় পড়িয়া শুধু এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। লক্ষী দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিল, “অমন ছটফট কচো কেন?”

বাশী উত্তর দিল, “ঘুম ধরে না।”

পরিশেষে স্বামীর এই অস্থিৰতা অসহ্য হইলে লক্ষী তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিল, “দেখ, দিদিকে ছেড়ে যখন তুমি থাকিতে পারবে না, তোমার নেয়ে থেয়ে শুয়ে কিছুতেই স্থখ নাই, তখন এক কাজ কর, দিদির কাছে গিয়ে তাকে শাস্ত ক’রে ফিরিয়ে নিয়ে এস।”

স্বাৰ উপদেশ শুনিয়া বাশী অকুটী করিল মাত্র, কোনই উত্তর দিল না।

পার্কতীকে ফিরাইয়া আনিতে বাশীর যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু প্রবল অভিমান আসিয়া সে ইচ্ছাকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। কেন, সে কি এতই শিশু যে, দিদি নহিলে তাহার দিন চলিবে না? দিদি যদি তাহার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকিতে পারে, থাকিয়া যদি স্থখী হয়, তবে বাশীই কি দিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না? তাহার মন মেয়েমানুষের মন হইতেও কি দুর্বল? দিদিকে ছাড়িয়া স্থখে না হউক, কষ্টেও কি সে দিন কাটাইতে পারিবে না!

স্বামীর ঘর

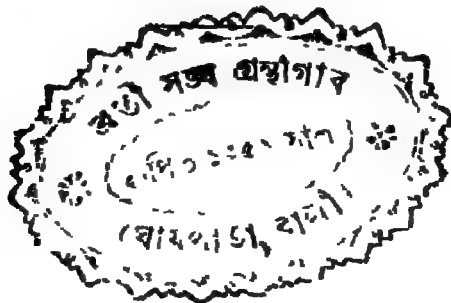
বাঁশী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হউক, পাবিতেই হইবে।

তিনদিন এই ভাবেই কাটিল। চতুর্থ দিনে বাঁশী কিন্তু থাকিতে পারিল না। সকালে উঠিয়াই জামা-কাপড় পরিয়া দিদির কাছে যাইবাব জগ্ন প্রস্তুত হইল। দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাচ্ছা ? ঠাকুরঝির কাছে বুঝি ?”

• এই জিজ্ঞাসার মধ্যে বাঁশী যেন স্বীর অধবপ্ৰাপ্তে একটু উপহাসের হাসি দেখিতে পাইল। দেখিয়া ভ্রুকুটি কবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ইতস্ততঃ কবিয়া উত্তর দিল, “না, আমগাছীতে যাত্রা হবার কথা আছে, তাই যাচ্ছি।”

বাঁশী বাহির হইল বটে, কিন্তু দিদিব কাছে যাইতে পারিল না। ঋনিক বেলা পর্য্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

দশদিন এইভাবে কাটিবার পর যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার চিত্ত মেয়েমানুষের চিত্ত অপেক্ষাও দুর্বল, এবং এই দুর্বল চিত্তকে সে কিছুতেই সবল করিতে পারিবে না, তখন সে জোখ, অভিমান সব দ্ব.ব কেলিয়া, লক্ষ্মীর উপহাসকে তুচ্ছ কবিয়া ব্যাকুলভাবে পার্শ্বভীর নিকট ছুটিয়া গেল।



চতুর্বিংশ পলিচেহুদ

পার্কতী খোকাকে বোলে শোয়াইয়া হাঁটু নাচাইয়া ঘুম পাডাইতে-
ছিল,—

“আয় রে আয়,
খোকামণি ঘুম যায়।
খোকা ঘুমলো পাডা জুড়ুলো
বর্গী এলো দেশে,
চড়াই পাগীতে ধান পেয়েছে
পাঞ্জনা দেব কিসে।”

বাঁশী বাডী ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “দিদি!”

“কে রে, বাঁশী?”

“হাঁ দিদি, আমি।”

বাঁশী আসিয়া পার্কতীর সম্মুখে ধপ্ কবিতা বসিয়া পড়িল। পার্কতী
জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছিস তুই? বৌ কেমন আছে?”

বৌচার খুঁটটা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বাঁশী উত্তর দিল,
“ভাল।”

পার্কতী খোকার আধ-ঘুমন্ত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, “বৌকে ফেলে হঠাৎ চলে এলি যে?”

প্রশ্নটা বাঁশীর নিকট যেমন অর্থহীন, তেমনই কণ্ঠের বোধ হইল।

আমার ঘর

কেন যে আসিল, দিদি কি তা জানে না ? আজ দশদিন যে না আসিয়া সে চুপ কবিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট । ঈষৎ ব্যথিতস্ববে বাঁশী উত্তর করিল, “তোমাকে একবার দেখতে এলুম দিদি ।”

শুধু দেখিতে আসিয়াছে ! তাহা হইলে পার্কতীকে লইয়া যাইবার জন্ত বাঁশীর আগ্রহ নাই ! ইহাকেই বলে আপন আর পর । আপন হইলে কি এতদিন পরে শুধু একবার দেখিতে আসিতে পারিত ? ফিরাইয়া লইয়া যাইবাব জন্ত পিছনে পিছনেই ছুটিয়া আসিত । সে আসিবে না জানিয়াও কালাচাঁদ কতবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত ছুটিয়া গিয়াছে । পার্কতী এইখানেই ভায়ের ঘরের সঙ্গে স্বামীর ঘরের পার্থক্য বুঝিতে পারিল । ওঃ, না বুঝিয়া সে কি ভয়ানক ভুলই করিয়াছে । বেদনামলিনমুখে পার্কতী বলিল, “এসে ভালই করেছিস্ । আমিও মনে কচ্ছিলুম, একটা লোক পাঠিয়ে তোদের খবর নেব ।”

বাঁশী অত্মদিকে মুখ রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল । পার্কতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “তোর কষ্ট হচ্ছে না বাঁশী ?”

জানিয়া শুনিয়া দিদিকে এমন প্রশ্ন করিতে দেখিয়া রাগে বাঁশী বেন ফুলিয়া উঠিল, দুঃখে চোখে জল আসিল । কষ্টে সে-রাগ ও দুঃখ চাপিয়া বাঁশী যেন নিতান্ত তাক্ষীল্যের সহিত উত্তর করিল, “না, কষ্ট আর কি ! তুমি ভাল আছ তো ?”

গম্ভীরমুখে পার্কতী বলিল, “আমাব আর ভাল মন্দ কি বাঁশী, স্বথ হোক দুঃখ হোক, এ আমার নিজের ঘর !”

বিশ্বয়চমকিত দৃষ্টিটা পার্কতীর দিকে ফিরাইয়া বাঁশী জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কি তোমার নিজের ঘর দিদি ?”

আমীর ঘর

স্থিরস্থরে পার্শ্বতী বলিল, “হাঁ, নিজের ঘর বৈ কি। মেয়েমানুষের স্বামীর ঘরই নিজের ঘর, তা ছাড়া আর সবই পরের ঘর।”

সর্বনাশ। এ কথাটা তো বাঁশী একদিনের জন্তুও ভাবিয়া দেখে নাই। তাহা হইলে তাহার ঘরটা দিদিব কাছে পবের ঘর, আর এটা তাহার নিজের ঘর। এখানে দিদি স্বাবীন, আর সেখানে পরাবীন,—লক্ষ্মীর অবীনে তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল, লক্ষ্মীর কবুজ তাহাকে মাথা পাতিয়া সহিয়া মাইতে হইয়াছিল। এইজন্তই লক্ষ্মীর ভীত বাবাবানের উত্তরে পার্শ্বতী একটুও জোব দেখাইতে বা বাঁশীকে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। নিরোধ বলিয়াই বাঁশী এই সহজ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া দিদিব উপর বাগ করিত। কি নিরোধ সে। পার্শ্বতীব কথা শুনিয়া বাঁশী নীচবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

রমা ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়াছিল, সে বাড়ী ঢুকিয়াই বাঁশীকে দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, “দাদা যে। কখন এলে দাদা? ও মা, দাদাকে একথানা আসনও দেওয়া হয়নি?”

পার্শ্বতী। তুই ঘাটে, আমার কোলে থাকা। কে আসন দেবে? রমা তাড়াতাড়ি বাসনের গোছা নামাইয়া আসন দিতে ব্যস্ত হইল। বাঁশী তাহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, “আর আসন দিতে হবে না। আমি এখন চল্লম দিদি।”

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বতী বলিল, “এম্মনি দাবি? এ বেলা থাকবি না?”

“না” বলিয়া বাঁশী উঠানে নামিয়া পড়িল। পার্শ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “আবার কবে আসবি?”

বাঁশী বলিল, “যখনই ফুরসৎ পাব, তখনই এসে তোমায় দেখে দাব দিদি।”

স্বামীর ঘর

পার্কীতী বলিল, “কষ্ট হ’লে আমাকে খবর দিবি।”

জোরে মাথা নাড়িয়া বাঁশী বলিল, “তা দেব। কিন্তু আমার কিছু কষ্ট নাই দিদি, আমার জগৎ তুমি ভেবো না।”

বাঁশী চলিয়া গেল। পার্কীতী খোকার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে কালচাঁদ আসিয়া পার্কীতীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাঁশী তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল না?”

পার্কীতী বলিল, “দেখতে এসেছিল।”

কাল।। নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে না?

পার্কী। বললেই বা যাচ্ছে কে?

কাল।। কিন্তু বাঁশীকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

পার্কী। কেন পারবো না? সেখানে আমার কি?

কাল।। এখানেই বা তোমাব কি?

ঘরের ভিতর হইতে বমা উত্তর দিল, “এখানে কি, তুমি কি বুঝবে? এ যে হচ্ছে স্বামীর ঘর।”

কালচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, “স্বামীর ঘর না সতীনের ঘর?”

বমা স্বামীকে বন্ধাব দিয়া বলিল, “তোমাকে বলেছে, সতীনের ঘর। কাবো ঘর নয়, এটা খোকাব ঘর, দিদি হচ্ছে খোকার মা।”

“আর তুমি?”

“আমি দিদির বাদী।”

বনার উত্তরে কালচাঁদ ও পার্কীতী উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

দেব-সাহিত্য-কুটীর হইতে প্রকাশিত

কথা-সাহিত্যের কোহিনুর

—কয়েকখানি ভাল-ভাল উপন্যাস—

প্রত্যেকখানির দাম—মাত্র এক টাকা।

জলছবি

লেখক—শ্রীহিরণ্ময় সেন

নৌকাডুবি-তে নারিকা ডুবলো জলে ; পদ্মার এক জনবিরল ঘাটে ব'সে নায়ক তাই দেখলে । তাব বলিষ্ঠ দেহ আব উৎসাহিত মন, আপন জীবন তুচ্ছ ক'রে তবঙ্গসঙ্কুল জলরাশি থেকে নারিকাকে নুকে ক'রে কূলে নিয়ে এলো ।

নায়ক ভাবলে—যুগন্ত পুৰী থেকে স্তম্ভা রাজকন্যা এনেছে তার ঘবে ।

নারিকা ভাবলে—নায়কের সোনার কাঠিব পবন পেয়ে কুমারী-জীবন তাব ধন হ'য়ে গেছে । তার সর্কাজে বসন্তের শিহরণ জেগে উঠেছে । তার কিশোর-অস্তবের মন্দির-দ্বারে বসন্ত এসেছে—অনাহুতের মত !

'জলছবি'র পাতায়-পাতায় অনুবিল আনন্দ !

'জলছবি'র ভাবে-ভাষায় অপার্বিব সৌন্দর্য্য !

'জলছবি' পড়বার মত বই—প্রিয়জনের হাতে দিতে জলছবিই একমাত্র উপহারের সামগ্রী ।

পরদেশী

লেখিকা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

‘পরদেশী’-নায়ক শঙ্কর পণ্ডিতের দৃঢ়তা এ-যুগে প্রত্যেক নর-
নাবীর আদর্শ হওয়া উচিত।

‘পরদেশী’ খালি উপভাস নয়—উপদেশ ও নীতিতে পরিপূর্ণ।
ভাষায় কবিতাব ছন্দ, স্টেটে গভীর কৌতূহল। অভাগী সরযু চরিত্র
আগাগোড়াই মর্ম্মস্পর্শী—করুণ।

আজকালকার দিনে অস্পৃশ্যতাব পাপে হিন্দু-সমাজের যে কত
বেশী অধঃপতন হচ্ছে,—নেচাবী সবষু তাব হাতে হাতে প্রমাণ
দিয়েছে।

সেকাল ও একালে সামঞ্জস্য বজায় বেখে ‘পরদেশীর’ পবিসমাপ্তি,
—সুন্দর—অনুপম!

—মায়াজাল—

লেখক—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

‘মায়াজালের’ শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—যিনি এই বইখানি লিখেছেন,
তিনিই লিখেছেন অপূর্ব ব্যঙ্গনাটিকা ‘মানময়ী গার্লস্ স্কুল।’
ছবির পর্দায়, থিয়েটারের মঞ্চে, লোকের ঘরে-ঘরে মানময়ীগার্লস্
স্কুল যেমন সমাদর লাভ করেছে—আমাদের প্রকাশিত ‘মায়াজাল’ও
উপভাস হিসাবে তেমনি সমাদর পেয়ে আসছে, ‘মায়াজালের’
ভুলনা! একমাত্র মায়াজাল।

